ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

জীবজগতের সৃষ্টি রহস্য

মোঃ আব্দুল ওয়াহাব

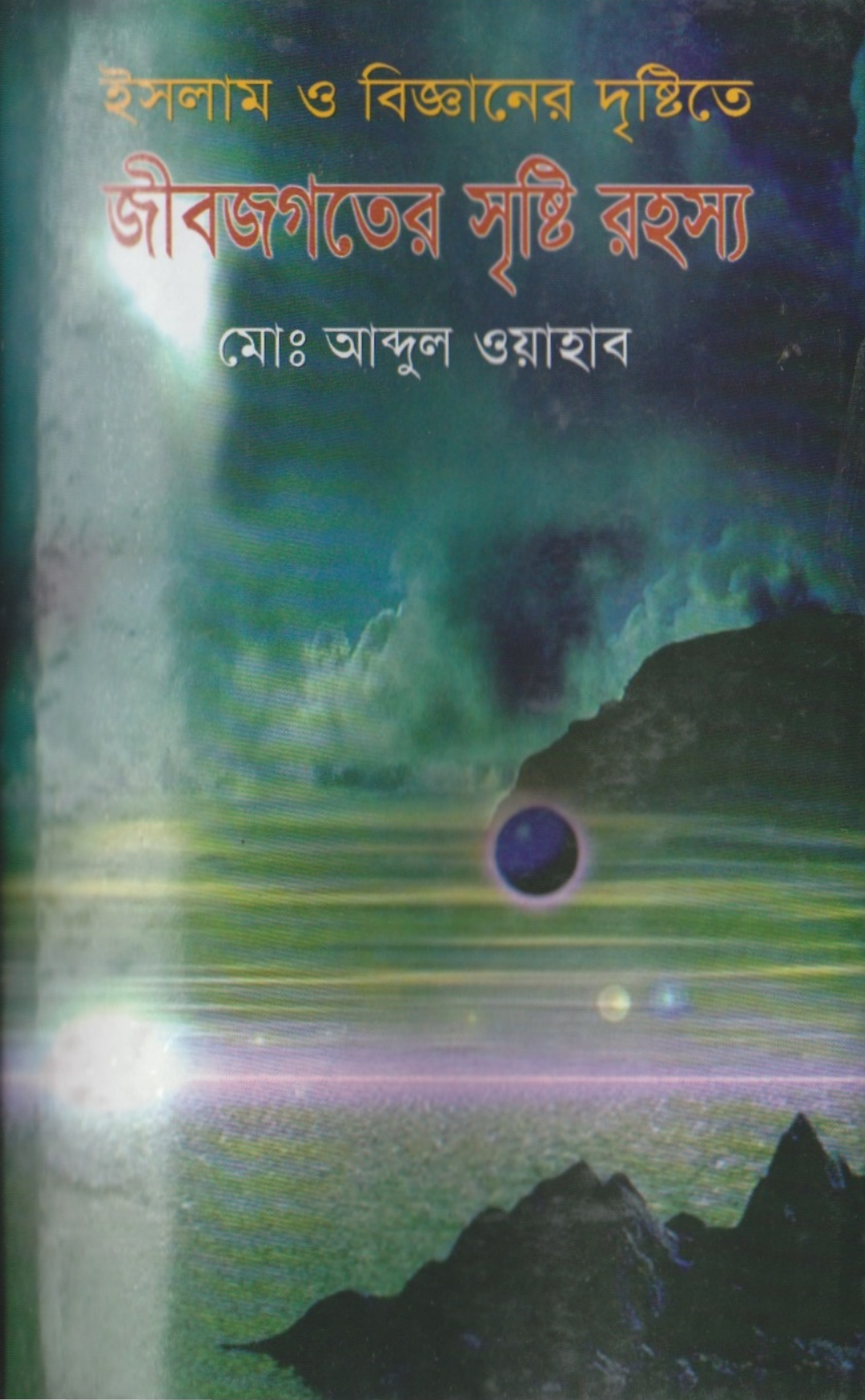

উৎসর্গ
পরলোকগত আম্মাজানকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সহযোগিতায় ডা. মোঃ শামীম হোসেন
এম বি বি এস, বি সি এস (স্বাস্থ্য)
প্রভাষক, এ্যানাটমি বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
মোবাইল : ০১৭১২ ৫২৩৭৬১

কৃতজ্ঞতা স্বীকার মোঃ আব্দুস সালাম
মোঃ নজরুল ইসলাম (নান্নু)
মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার, যাঁর সীমাহীন কৃপায় বইটা প্রকাশ করা সম্ভব হলো। জীবের উৎপত্তি কীভাবে পৃথিবীতে হয়েছিল মানবতার এ এক চিরন্তন জিজ্ঞাসা। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে সর্বকালের মণীষি ও পণ্ডিতবৃন্দই এ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজেছেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথা আছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানও এ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা ও গবেষণা করেছে ও করছে।

পৃথিবীতে জীব ও জীবজগতের উদ্ভব ও বিকাশের ব্যাপারে বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদের স্বতন্ত্র মত থাকলেও একটি ব্যাপারে তারা সকলেই একমত এবং তা হচ্ছে তারা কেউই জীবের সৃষ্টিতে বিশ্বাসী নয়, সুতরাং তাদের মতে জীব বা জীবজগতের কোনও স্রষ্টাও নেই, তা আপনা আপনিই উদ্ভূত। কিন্তু ইসলাম উদ্ভবে বিশ্বাসী নয়, সে সৃষ্টিতে বিশ্বাসী এবং তাই সে স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। সে কারণে জীবজগত আপনা আপনিই উদ্ভূত নাকি স্রষ্টা তথা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট সে কথা চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন।

ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবজগতের সৃষ্টি রহস্য বইতে জীবের উৎপত্তি ও জীবজগতের বিকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলে এবং ইসলাম কি বলে তা উল্লেখপূর্বক লেখক তাঁর নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা আলোচনা এবং বিজ্ঞানের কথা নাকি ইসলামের কথা সঠিক তা নির্ণয় করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ বইটা পড়ে যদি বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন তবেই তাঁর এই শ্রম সার্থক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত অন্য বই

মে'রাজ ও বর্তমান বিজ্ঞান

লেখকের প্রকাশিতব্য বই

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে মানব প্রজনন কৌশল

www.pathagar.com

এক

পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল মানবতার এ এক চিরন্তন জিজ্ঞাসা। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে সর্বকালের মণীষি ও পণ্ডিতবৃন্দই এ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজেছেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথা আছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানও এ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা ও গবেষণা করেছে ও করছে। এই বইতে জীবের উৎপত্তি ও জীবজগতের বিকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলে এবং ইসলাম কি বলে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে আমরা বিজ্ঞানের কথাই বলছি। পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব ও বিকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞানের তিনটি মতবাদ আছে। বিভিন্নরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গঠিত এ তিনটি মতবাদ হচ্ছে (১) সর্বাধুনিক কালের "জৈব বিবর্তনবাদ (Theory of Organic Evolution)", (২) অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা "বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব (Theory of Special Creation)" এবং (৩) মধ্যবর্তী সময়ের "আকস্মিক মহাপ্রলয় মতবাদ (Theory of Catastrophism)"। সর্বাগ্রে জৈব বিবর্তনবাদ সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। কিন্তু তার আগে জীব কাকে বলে সে কথা বলে নেয়া দরকার।

এক কথায়, যার জীবন আছে তাকেই জীব বলা যায়। কিন্তু এই জীবন কি? সত্যি বলতে কি, জীবনের কোনও সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত দেয়া যায়নি। কারণ, এর স্বরূপ কি সে কথা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। এর সম্বন্ধে এটুকুই শুধু বলা যায় যে, জীবন এমন একটি ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত সত্ত্বা যা জড়দেহের মধ্যে বিধৃত হলে দেহ বিশেষ কতকগুলো লক্ষণ প্রকাশ করে। অর্থাৎ জীবনকে কেবলমাত্র দেহের মাধ্যমে তার প্রকাশ দ্বারাই চেনা এবং জানা যায়; অন্য কোনভাবেই তার পরিচয় জানা যায় না। জড়দেহ মধ্যে যতক্ষণ জীবন বিধৃত থাকে ততক্ষণই দেহ জীবিত থাকে এবং ততক্ষণই তাকে একটি জীব বলা যায়। জীবন বিহীন দেহ একটি নিছক জড় বস্তুপিণ্ড। সুতরাং জীব মানেই জীবনবিশিষ্ট জড় দেহ। এবার এই জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনবাদ কি বলে সেই কথা বলা যাক।

www.pathagar.com

আধুনিক জীববিজ্ঞান তার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে জীবদেহ এবং জীবের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও জীবন বা জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে অর্থাৎ জীবনের স্বরূপ কি এবং সর্বপ্রথম জীবটির উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল তথা সর্বপ্রথম জড়দেহটিতে কীভাবে জীবন বিধৃত হয়েছিল বিজ্ঞান আজও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আছে বলেই বলা যায়। সোজা কথায় বিজ্ঞান জীবকে নিয়েই আলোচনা করেছে, তার উৎপত্তি নিয়ে বিশেষ ভাবেনি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, বিজ্ঞান জীবের উৎপত্তির ব্যাপারে উৎসাহিত বা কৌতূহলী নয় এবং তাও সম্ভবত এজন্য যে, প্রশ্নটি সরাসরিভাবে জীবনের সঙ্গে জড়িত, যে জীবন ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত বিধায় বিজ্ঞানের মাপ-জোঁক ও যান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতির বাইরে। বিজ্ঞানের কারবার জড়াতীত সত্ত্বাকে নিয়ে নয়। যা কোনও স্থান দখল করে না এবং যার কোনও ওজন নাই ও যা গতির পরিবর্তনে বাঁধা প্রদান করে না বিজ্ঞান তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তাই জীবনের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার ভার সে প্রধানত ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রের উপরই ছেড়ে দিয়েছে বলে মনে হয়। ধর্মতত্ত্বসমূহের মধ্যে ইসলাম এ সম্বন্ধে কি বলেছে সে কথা আমরা পরে বলবো। আপাতত জীবন ও জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে জীববিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান দর্শন তার জৈব বিবর্তনমূলক মতবাদে কি বলে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

বিবর্তনবাদ বলে যে, প্রায় পনরশো কোটি বছর আগে সৃষ্ট হওয়ার সময় পৃথিবী প্রচণ্ডরূপে উত্তপ্ত এক বস্তুপিণ্ড ছিল। (কীভাবে তা সৃষ্ট হয়েছিল বিবর্তনবাদ সে সম্বন্ধে কিছু বলে না। বিজ্ঞানের অন্য শাখায় এবং ইসলামে সে আলোচনা আছে এবং আমিও অন্যত্র তা করেছি।) তারপর থেকে ক্রমশ তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবের উদ্ভব ও জীবন ধারণের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশের সৃষ্টি হতে থাকে। সেই সঙ্গে পৃথিবীপৃষ্ঠের তরল পানির মধ্যে জীবনের ভৌতিক বুনিয়াদ (Physical basis of life) প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর রাসায়নিক গঠন সম্পন্ন হতে থাকে। প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ হচ্ছে জীবদেহের গঠনমূলক একক কোষ-এর জেলীর ন্যায়, অর্ধতরল, অর্ধস্বচ্ছ জটিল কলয়ডীয় (Colloidal) অংশ, যা একটি অতি বিস্ময়কর ও সজীব গতিশীল বস্তু। ইহা জীবনাণুস্বরূপ। এই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর ভৌত দেহ একটি অতীব জটিল পদার্থ যার মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি অন্যূন ছত্রিশটি মৌলিক উপাদান আছে। এরা বিভিন্ন প্রকার জটিল জৈব ও অজৈব যৌগ হিসাবে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এ বিদ্যমান আছে। প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর

www.pathagar.com

শতকরা ৬৫-৮০ ভাগই পানি। সব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর মধ্যেই DNA (Deoxyribo-nucleic Acid) নামে যে নিউক্লিয়িক এসিড বর্তমান থাকে উহাকেই জীবনের 'ধারক উপাদান' বলে চিহ্নিত করা হয়। সব জীবদেহেরই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ ঠিক একই প্রকার নয়।

যদিও DNA-কেই জীবনের ধারক উপাদান এবং প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-কেই জীবনের ভৌতিক বুনিয়াদ বলা হয় তথাপি এটা স্মর্তব্য যে, তারা নিজেরা কেউই কিন্তু জীবন নয়। জীবন ইন্দ্রিয়ের অনুভবের অতীত অন্য একটি 'শক্তি' বা সত্ত্বা যা DNA বা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর মধ্যে বিধৃত হলে উহারা জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করে। এই শক্তি বা এই সত্ত্বা যে কী এবং এর স্বরূপ যে কী বিজ্ঞান তা আজও জানতে পারেনি। ভাইরাসকে জীব ও জড়ের যোগসূত্র বলা হয়। একটা ভাইরাসের দেহ মূলত DNA নামক জড় উপাদান দ্বারা গঠিত–যার বাইরে থাকে একটা প্রোটিন আবরণ, তাও জড় পদার্থ। সম্মিলিতভাবে এ একটি নিউক্লিও-প্রোটিন। যতক্ষণ বোতলে রক্ষিত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ ভাইরাসটি একটি জড় পদার্থই। কিন্তু যখনি এটাকে এর উপযুক্ত পোষক জীবের (সব ভাইরাস সব জীবের দেহে সক্রিয় হয় না, বিশেষ বিশেষ ভাইরাস বিশেষ বিশেষ জীবের দেহে সক্রিয় হয়। সেই বিশেষ জীবকে সেই বিশেষ ভাইরাসের পোষক বলা হয়।) দেহে ছেড়ে দেয়া হয় তখনি উহা 'সজীব' হয়ে ওঠে এবং ওই পোষক জীবদেহের সজীব উপাদান সহযোগে দ্রুত বংশবিস্তার করতে থাকে–উহা পরিণত হয় একটি 'জীব'-এ। কী সেই শক্তি যা সে ওই পোষক দেহে ছেড়ে দেয়া মাত্র পেল এবং কোথা থেকেই বা পেল-যার প্রভাবে জড় ভাইরাসটি জীবে পরিণত হলো তাকে কিন্তু জানা গেল না। সে জীবন সে কিন্তু পোষক দেহের সজীব কোষ থেকে পায়নি কিংবা পোষক দেহের জীবনের অংশবিশেষ নিয়েও সে 'জীবিত' হয়নি; কারণ জীবন অবিভাজ্য এবং তা দেহান্তরযোগ্য নয়। সুতরাং আমরা দেখি যে, বিজ্ঞান একটি জীবদেহকে বিশ্লেষণ করতে করতে একেবারে জীবনের ধারক উপাদান বলে কথিত DNA পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ঠিকই কিন্তু জড় রাসায়নিক উপাদানসমূহ দ্বারা গঠিত DNA যার প্রভাবে জীব হয়ে ওঠে তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও ঠিক সেই স্তরেই আছে যে স্তরের জ্ঞান দিয়ে আমরা আজও জানতে পারি না যে কী সেই সত্ত্বা যার অবিদ্যমানতায় একটু আগের জীবিত মানবদেহটি এখন পরিণত হয়েছে এক জড় বস্তুপিণ্ডে!

যাহোক, বিজ্ঞানীরা বলেন, বিভিন্ন প্রকার জটিল জৈব ও অজৈব যৌগসমূহের সহযোগে পৃথিবীর জলীয় মাধ্যমের মধ্যে শতকরা ৬৫-৮০ ভাগ

www.pathagar.com

পানি দিয়ে গঠিত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর ভৌতদেহের গঠন যখন সম্পূর্ণ হলো এবং তার আভ্যন্তরীণ গঠন ও বাইরের পরিবেশও যখন একটা সঠিক (Critical) রূপ ও একটা সঠিক (Critical) অবস্থা পেল অর্থাৎ পৃথিবীর পরিবেশ যখন জীবনের উদ্ভব ও জীবের জীবন ধারণের জন্য ঠিক অনুকূল অবস্থায় এলো তখনই তা অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর সেই ভৌত দেহ 'হঠাৎ করে' জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ বা জৈবিক গুণাবলী প্রদর্শন করতে শুরু করলো, প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর ভৌত দেহ পেল জীবন, উৎপন্ন হলো পৃথিবীর প্রথম জীব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই যে জীবন যার প্রভাবে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর ভৌত দেহ জীবিত হয়ে উঠল, বিজ্ঞানের মতে, তা কিন্তু তার জড়দেহের বাইরে থেকে তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কোনও কিছু নয়, তা হচ্ছে তার ভৌত দেহের অভ্যন্তরস্থ ভৌত উপাদানরাজির এক প্রকার 'কর্মক্ষমতা' যা সেই উপাদানসমূহের একটি 'সঠিক' রূপ গঠন এবং পারিপার্শ্বিকতার একটা সঠিকরূপ অবস্থার কারণে ওই সব উপাদান থেকেই উৎপন্ন। অর্থাৎ উপাদানগুলো যে মূহূর্তে সেই গাঠনিক অবস্থার সঠিকতা অর্জন করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সেই সঠিকরূপ অনুকূলতা অর্জন করে ঠিক সেই মূহূর্তেই তার মধ্যে উৎপন্ন হয় সেই সব গুণাবলী বা সেই সব ক্রিয়াকলাপ (যাদেরকে আমরা জৈবনিক বা জৈবিক বলে থাকি) প্রদর্শনের ক্ষমতা, যাকে আমরা বলি জীবন পাওয়া। বিজ্ঞানীরা বলেন, সর্বপ্রথম জীবটি এভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল। Somehow a speck of protoplasm came to exist in the aqueous medium of the earth-'কোনওভাবে' হঠাৎ এক মূহূর্তে পৃথিবীর জলীয় মাধ্যমে আর্বিভূত হয়েছিল এক বিন্দু প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌, একটি জীবনাণু। এখানে সেই 'ভাবটি' যে কী 'ভাব' তা অবশ্য বলা হয়নি। যাহোক এতে আমরা দেখি যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবন জীবের জড়দেহের মধ্যে বাইরে থেকে অনুপ্রবিষ্ট কোনও সত্ত্বা নয় এবং জীবন বা জীবের উৎপত্তির জন্য কোনও স্রষ্টারও প্রয়োজন হয়নি। কারণ, প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর ভৌত দেহও গঠিত হয়েছিল আপনা থেকেই, বাইরের পরিবেশও অনুকূল হয়েছিল আপনা থেকেই এবং প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর ভৌত দেহে প্রাণের সঞ্চারও হয়েছিল আপনা থেকেই। অর্থাৎ সর্বদিক দিয়েই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ একটি অনুপম, স্বয়ম্ভূ ও স্বয়ং স্থিতিশীল সত্ত্বা। কিন্তু জন্মমৃত্যুর সীমার অধীন এ সত্ত্বা আসলেও কি তাই?

এখানে একটি কথা অবশ্যই বলে রাখা দরকার; আর তা হচ্ছে এই যে, এ পর্যন্ত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর গঠন সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি তা কিন্তু তার জীবিত দেহ সম্পর্কে নয়, তার মৃত দেহ সম্পর্কে। জীবিত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর দেহের

www.pathagar.com

গাঠনিক উপাদান মৃত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর দেহের গাঠনিক উপাদান থেকে অবশ্যই ভিন্ন। সুতরাং গাঠনিক উপাদানসমূহের কোন সঠিকতায় (Critical Stage) উপনীত হলে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর জড়দেহে জীবনের স্ফুরন হয় তা নির্ণয় করার কোনও উপায় আপাতত বিজ্ঞানের জানা নেই; কারণ প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-কে জীবিত রেখে তার দেহ বিশ্লেষণ করা যায় না। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের আরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সঠিকতার সন্ধান যদি পাওয়া যায় তাহলে গাঠনিক উপাদানসমূহকে সেই সঠিকতায় নিয়ে গিয়ে বিজ্ঞান নিজেই একদিন সজীব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ তৈরি করতে পারবে, যদি জীবন সত্যি সত্যি বাইরে থেকে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে দেয়া কোনও দেহাতীত সত্ত্বা না হয় এবং সত্যি সত্যিই যদি তা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর দেহের সেই সঠিকতায় উপনীত জৈব ও অজৈব যৌগসমূহের অভ্যন্তর থেকে উৎপন্ন কিছুই হয়। সঙ্গতভাবেই এখানে একটা প্রশ্ন আসে, আর তা হচ্ছে এই যে, তাহলে কি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মিথ্যে হয়ে যাবে? না, তা মোটেই নয়; বরং তাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব আরও দৃঢ়ভাবে সপ্রমাণ হবে। মনে রাখা দরকার যে, তেমন দিন যদি আসেই মানুষ যদি নিজেই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ তথা জীব সৃষ্টি করতে পারেই–আর খোদা মানুষকে সে জ্ঞান যে দিতেও পারেন তার ইঙ্গিত আমরা এ থেকেই পাই যে, 'দজ্জাল'ও জীব সৃষ্টিতে সক্ষম একজন বিজ্ঞানীই হবে-তাহলে তদ্বারা বরং এটাই দৃঢ়ভাবে সপ্রমাণিত হবে যে, জীব আপনাআপনিই উদ্ভূত হতে পারে না, তাকে সৃষ্ট হতে হয় এবং তাকে সৃষ্টি করার জন্য একজন বিজ্ঞানাভিজ্ঞ স্রষ্টার প্রয়োজন হয়। আর, সে সময়ে মানুষ যে জীব সৃষ্টি করবে–যদি করেই তবে তা হবে প্রথমে সৃষ্ট হয়েছিল এমন একটা আদর্শকে অনুকরণ করে সৃষ্টি করা। বিনা আদর্শে একেবারে প্রথমে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ বা জীব সৃষ্টি করতে অবশ্যই মানুষ বিজ্ঞানীর চাইতে অনন্তগুণ বেশি ও অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন ছিল এবং সেটা একমাত্র অসীম জ্ঞান, কুদরত ও হেকমতের অধিকারী একজন আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাছাড়া মানব সৃষ্ট সেই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ বা জীবসৃষ্টি করবার মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার অধিকারী যে মানুষ বিজ্ঞানীটি সেও যখন জীব হিসাবে স্বয়ম্ভূ ও স্বয়ং সৃষ্ট নয় তা হতেও পারে না তখন তাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ্‌ যে আবার কতখানি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার অধিকারী তা মানুষের কল্পনারও অতীত!

যাহোক, উপরে আমি যা বলেছি বিজ্ঞানের ভাষায় তাই-ই প্রথম জীবের উদ্ভবের ইতিহাস। তারপরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজ। বিজ্ঞান বলে যে,

www.pathagar.com

যেহেতু জীবনের ধর্মই বেঁচে থাকা, তাই এই বেঁচে থাকার জন্য যা করতে হয় প্রথম জীব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ তাই-ই করতে থাকল। খাদ্যগ্রহণ সহ আর সব জৈবিক ক্রিয়াকলাপ, জীবন সংগ্রাম, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন, প্রকরণ, বংশবিস্তার এবং যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন প্রভৃতি সবই সে করতে থাকল এবং তাতে করে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ থেকে প্রাককেন্দ্রিক কোষ, প্রকৃত কোষ, তারপর প্রথমে ক্লোরোফিলবিশিষ্ট এককোষী উদ্ভিদ এবং অতঃপর মিউটেশনের মাধ্যমে ক্লোরোফিলের অবলুপ্তি দ্বারা এককোষী প্রাণী প্রোটোজোয়া থেকে শুরু করে মানুষ এবং অতি দানবিক তিমি মাছ পর্যন্ত সব প্রাণীই উদ্ভূত হলো লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছরের এক দীর্ঘ বৈবর্তনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, এই যে বিবর্তন প্রক্রিয়া, এ একটিমাত্র নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে একটিমাত্র পথে অগ্রগামী হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে অভিযোজিত হওয়া এবং ভেদ বা প্রকরণের কারণে একই জীব থেকে বিভিন্ন জীব ও বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে এবং আজ আমরা পৃথিবীর বুকে যে সব জটিল জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) দেখতে পাচ্ছি তারা সবই তাদের পূর্বে বিদ্যমান অপেক্ষাকৃত সরল জীব থেকে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত এবং সামগ্রিকভাবে তারা সকলেই সেই প্রথম প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এরই বংশধর। সুতরাং এ হিসাবে বিবেচনা করলে একটা এ্যামিবা এবং একজন মানুষ বা একটি তিমি মাছে কোনও প্রভেদ নেই; তাদের মধ্যে আসলে যে পার্থক্য তা হলো তাদের দৈহিক গঠনে অর্থাৎ তাদের দেহের কোষের সংখ্যায় ও সে সব কোষের সজ্জায়। মৌলিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপের দিক দিয়ে তারা সব এক ও অভিন্ন। কিন্তু আসলেও কি তাই?

বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে বলা হলো। এবার বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা যাক।

বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয় যে, পৃথিবী সৃষ্ট হওয়ার পর কালক্রমে উহার পরিবেশ যখন জীবের উদ্ভব ও জীবন ধারণের অনুকূল হলো তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ উপকরণাদির সহযোগে পৃথিবীতে এখন আমরা যে সব জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণী-দেখতে পাচ্ছি তারা সবই আপনা-আপনিই উদ্ভূত হয়েছিল। এসব জীবই একদিনে এবং একই সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল কিনা বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বের প্রবক্তারা অবশ্য স্পষ্ট করে সে কথা বলেন নি। তবে মনে হয় এ তত্ত্বে সময়ের কথাটি খুব বেশি জরুরি নয়। তারা সবই একই পরিবেশে এবং একই সময়েও উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে আবার বিভিন্ন পরিবেশে সুতরাং বিভিন্ন সময়েও উৎপন্ন হয়ে

www.pathagar.com

থাকতে পারে। মূল কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে, যে কোনও প্রজাতির জীব তার পূর্ববর্তী কোনও প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়নি। প্রত্যেক প্রজাতির জীব পৃথক পৃথকভাবেই উৎপন্ন হয়েছিল এবং উৎপত্তির পর থেকে তারা বংশবিস্তার করেছে ঠিকই কিন্তু প্রজাতিগতভাবে তাদের আর কোনও পরিবর্তন বা রূপান্তর হয়নি। এ্যামিবা এ্যামিবা হিসাবেই জন্মেছিল এবং এখনো এ্যামিবাই আছে এবং ভবিষ্যতেও তাই-ই থাকবে–যদিও তার জন্ম-মৃত্যু ও বংশবিস্তার চলছেই। মানুষ মানুষ হিসাবেই উৎপন্ন হয়েছিল, এখনো তাই-ই আছে এবং পৃথিবীর ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সে তাই-ই থাকবে। মোটের উপর জীবের উৎপত্তির দিক থেকে বিশেষ সৃষ্টি তত্ত্বের মূল বক্তব্যটি বিবর্তনবাদের মতই। উভয়েই বলে যে, মানুষসহ সর্বপ্রকার জীবই আপনা আপনিই উদ্ভূত হয়েছিল বিধায় তারা সৃষ্ট নয় এবং তাই তাদের উদ্ভবে কোনও স্রষ্টারও প্রয়োজন হয়নি। শুধু পার্থক্য এই যে, বিবর্তনবাদ বিবর্তনে অর্থাৎ এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির উৎপত্তিতে বিশ্বাস করে এবং বলে যে, মানুষসহ আজ আমরা যে সব প্রাণী ও উদ্ভিদকে পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছি বিবর্তন ধারায় তারা কোনও শেষ জীব নয়, এ বিবর্তন চলতেই থাকবে পৃথিবীর ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত। আর, বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব বিবর্তনে বিশ্বাস করে না এবং বলে যে, প্রজাতিগুলো স্বতন্ত্রভাবেই উৎপন্ন হয়েছিল–আজ আমরা তাদেরকে যেভাবে দেখতে পাচ্ছি এবং পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত তারা তাই-ই থাকবে। দুই মতবাদের যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে তার কথা তো আগেই বলা হয়েছে এবং তা হচ্ছে তারা কেউই সৃষ্টিতে–সুতরাং স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয়, তারা উদ্ভবে বিশ্বাসী।

এবার আকস্মিক মহাপ্রলয় মতবাদ নামে জীবজগতের উদ্ভব সম্বন্ধীয় তৃতীয় মতবাদের কথা বলা যাক। এ মতবাদে বলা হয় যে, পৃথিবীর দীর্ঘ জীবনকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবকূল আপনা আপনিই জন্মলাভ করেছিল এবং এক একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বংশানুক্রমিকভাবে তারা বেঁচেও ছিল। তারপর হঠাৎ করে সংঘটিত এক একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তারা সব একবারে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কিছুকাল বিরতির পর বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন জীবশ্রেণীর জন্ম আপনা আপনিই হয় এবং কালে একই ধরনের বিপর্যয়ের ফলে তারাও ধ্বংস হয়ে যায় এবং আবার কিছুকাল বিরতির পর আবার সব নতুন নতুন জীবশ্রেণীর জন্ম হয়। ধ্বংস ও সৃষ্টির এই চক্রই চলছে এবং চলতেই থাকবে একেবারে পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত। প্রতি দুই কোটি ষাট লক্ষ বছর পর পর আকাশের জ্যোতিষ্কসমূহের এক বিশেষরূপ অবস্থানের কারণে

www.pathagar.com

পৃথিবীপৃষ্ঠে কোটি কোটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের মত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে পৃথিবীর জীবজগত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কিছুকাল বিরতির পর পুনরায় সৃষ্টি ও আবার ধ্বংস হয় বলে যে একটি তথ্য সম্প্রতি উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে এই আকস্মিক মহাপ্রলয় মতবাদের সমর্থন আছে। লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছরের প্রাচীন যে সব কংকাল আমরা এখন পাই তা সম্ভবত ধ্বংস হয়ে যাওয়া এইসব প্রাণীরই কংকাল। এছাড়া প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সব ডাইনোসোর একযোগে মারা গিয়েছিল বলে যে আরও একটি তথ্য আছে তার মধ্যেও এই মহাপ্রলয় মতবাদের কিছুটা সমর্থন পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

দুই

পৃথিবীতে জীব ও জীবজগতের উদ্ভব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের তিনটি মতবাদের কথা আমরা বললাম। এদের খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমরা পরে করব। আপাতত এই কথাটি জ্ঞাতব্য যে, জীবের উদ্ভব ও বিকাশের ব্যাপারে যার যার মত স্বতন্ত্র মত থাকলেও একটি ব্যাপারে তারা সকলেই একমত এবং তা হচ্ছে এই যে, তারা কেউই জীবের সৃষ্টিতে বিশ্বাসী নয়, সুতরাং তাদের মতে জীব বা জীবজগতের কোনও স্রষ্টাও নেই, তা আপনা আপনিই উদ্ভূত। বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব ও আকস্মিক মহাপ্রলয় মতবাদ প্রত্যেক জীবশ্রেণীকে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত বলে মনে করে, আর বিবর্তনবাদ একটিমাত্র আদি জীব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ থেকে সর্বপ্রকার জীবকে বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত বলে মনে করে। এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আপাতত মূলতবী রেখে পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব সম্পর্কে ইসলাম তথা আল কোরআন ও পবিত্র হাদীস কি বলে তাই দেখা যাক। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, ইসলাম উদ্ভবে বিশ্বাসী নয়, সে সৃষ্টিতে বিশ্বাসী এবং তাই সে স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। জীবজগতসহ সমগ্র জগতের সৃষ্টির ব্যাখ্যায় আদৌ কোনও স্রষ্টার প্রয়োজন আছে কিনা সে কথা আমরা পরে বলবো।

বিজ্ঞান যেখানে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকলকেই জৈবিক দিক থেকে অভিন্ন বলে মনে করে সেখানে ইসলাম কিন্তু তা করে না। ইসলাম মানুষকে আর সব জীব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখে। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে, জীবনবিশিষ্ট দেহী হিসাবে মানুষ ও অন্যান্য জীবকে অভিন্ন বলে মনে হলেও আসলে তারা অভিন্ন নয়। কারণ, মানুষ জীবনবিশিষ্ট দেহের উর্ধ্বেরও আরও কিছু। মানবদেহ মধ্যে জীবন ছাড়াও আরও একটি দেহাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত সত্ত্বা আছে। এই সত্ত্বাটির নাম রূহ্‌। এই রূহ্‌ কি সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন,

"এবং তারা তোমাকে রূহ্‌ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি বল যে, রূহ্‌ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের আদেশ।–এবং জ্ঞান থেকে তোমাদেরকে অতি অল্প ব্যতীত দেয়া হয়নি।" (১৭ ঃ ৮৫)

www.pathagar.com

"এবং যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলেন নিশ্চয় আমি প্রগাঢ় কর্দমের বিশুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করব। অনন্তর যখন আমি তাকে সংগঠিত করি এবং তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা (রূহ্) প্রবিষ্ট করাই তখন তোমরা তার সামনে সেজদাকারী হ'য়ো।" (১৫ঃ ২৮-২৯)

"যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলেন যে, নিশ্চয় আমি মৃত্তিকা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করব। অনন্তর যখন আমি তার নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেছিলাম এবং তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা (রূহ্) ফুৎকার করেছিলাম, তখন তদুদ্দেশ্যে প্রণতভাবে পতিত হও।" (৩৮ ঃ ৭১-৭২) এবং আল্লাহ্ আরও বলেন,

"আল্লাহ্ আত্মাসমূহকে পরিগ্রহণ করেন মৃত্যুকালে এবং যাদের মৃত্যু হয় না তাদের নিদ্রার সময়ে; অনন্তর তিনি উহাকে আবদ্ধ রাখেন যার উপর মৃত্যু অবধারিত হয়েছে এবং অন্যান্যকে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রমুক্ত করেন।" (৩৯ ঃ ৪২)

উপরে আল কোরআনের যে উদ্ধৃতি চারটি আমি দিয়েছি তা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে সৃষ্ট হয় একটি মানুষ। এদের প্রথমটি হচ্ছে একটি জড়দেহ, অপরটি জীবন বা প্রাণ যা আর সব জীবেও (উদ্ভিদ ও প্রাণী) আছে এবং তৃতীয়টি হচ্ছে রূহ্ যাকে আমরা পরমাত্মাও বলতে পারি। এ হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক ফুৎকার করে দেয়া একটা সত্ত্বা যা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁরই একটা হুকুম বা আদেশ। সুতরাং দেখা যায় যে, মানব দেহের মধ্যে দেহাতীত সত্ত্বা আছে দুইটি, যথা প্রাণ এবং রূহ্ অথচ অন্যান্য জীবে এরূপ সত্ত্বা মাত্র একটি–প্রাণ। মানবদেহের মধ্যে দেহাতীত সত্ত্বা যে দুইটি তা উদ্ধৃত ৪র্থ আয়াত থেকেই স্পষ্ট যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের নিদ্রার সময়ে তাদের রূহ্‌সমূহকে (এখানে নফ্‌স বলতে রূহ্‌কেই বুঝানো হয়েছে) দেহ থেকে বের করে নেন কিছু সময়ের জন্যে এবং যাদের উপর মৃত্যু অবধারিত হয়েছে তাদের দেহ থেকে চিরতরে। অথচ আমরা দেখি যে, ঘুমের মধ্যেও মানুষ জীবিতই থাকে, অর্থাৎ সে সময়েও তার দেহের মধ্যে জীবন বা প্রাণ থাকে যদিও এ সময়ে তার নফ্‌স বা রূহ্ দেহ থেকে বের করে লওয়া হয়, অর্থাৎ সে সময়ে রূহ্ তার দেহের মধ্যে থাকে না। সুতরাং দেহে প্রাণ থাকা অবস্থায়ও রূহ্ যখন দেহের মধ্যে না থাকতে পারে তখন সুস্পষ্টভাবেই এটা বোঝা যায় যে, প্রাণ বা জীবন এবং রূহ্ দুটো পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা। জীবন সব জীবেরই আছে এবং

www.pathagar.com

অন্যতম একটি জীব হিসাবে মানুষেরও আছে। মানুষের মধ্যে আরও একটি সত্ত্বা আছে রূহ্, যা মনুষ্যেতর অন্য কোনও জীবে নাই; আর এই রূহ্ প্রদত্ত হওয়ার কারণেই মানুষ জীব অন্য জীব থেকে পৃথক। জীবন যতদিন দেহের মধ্যে থাকে ততদিনই দেহ জীবিত, জীবনের অবর্তমানে দেহ মৃতদেহে পর্যবসিত হয়। কিন্তু রূহ্ দেহের মৃত্যু ছাড়াও দেহ থেকে বাইরে যেতে পারে সাময়িকভাবে–যেমন ঘুমের সময়ে। অবশ্য এ সময়েও দেহের সঙ্গে রূহ্-এর একটা অদৃশ্য বন্ধন থেকে যায়, যার কারণে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই রূহ্ পুনরায় দেহে ফিরে আসে। এ কারণেই ঘুমন্ত মানুষকে অতি ধীরে জাগানো রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নির্দেশ, যাতে রূহ্ ধীরে-সুস্থে দেহে ফেরার সময় পায়। অন্যথায় হঠাৎ করে ধড়মড় করে ঘুমন্ত মানুষকে জাগালে সেরূপ অবস্থায় রূহ্ অতি দ্রুত দেহে ফেরার মওকা নাও পেতে পারে এবং সেরূপ হলে দেহের সঙ্গে রূহের চিরবিচ্ছেদ বা মৃত্যুও ঘটে যেতে পারে, অথবা দেহের কোনও মানসিক বৈকল্য বা আঙ্গিক ক্ষতিও ঘটে যেতে পারে। মানবদেহের সঙ্গে রূহের চিরবিচ্ছেদ মানেই মৃত্যু, কারণ এরূপ হলে, মানুষের ক্ষেত্রে, জীবন বা প্রাণও আর দেহের মধ্যে থাকে না, মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রূহ্ যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালার খাল্ক্ ও আম্র্ সুতরাং এর একটি চিরস্থায়ী ও দেহ নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রাণ আল্লাহ্ তায়ালার অপরাপর নশ্বর সৃষ্টির মতই ধ্বংসশীল এবং তাই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার বিলুপ্তি ঘটে। উদ্ধৃত ২য় ও ৩য় আয়াত শরীফ থেকে আমরা দেখি যে, রূহ্ আল্লাহ্ তায়ালার খাল্ক্ ও আম্র্ হিসাবে একটি দেহাতীত সত্ত্বা যা মানবদেহ গঠনের এবং দেহে জীবন বা প্রাণ দানের পর দেহের মধ্যে ফুৎকার বা অনুপ্রবিষ্ট করে দেয়া হয়। উদ্ধৃত ১ম আয়াতে এই রূহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম বা আদেশ মাত্র; এবং ঠিক তার পরপরই খোদ রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-কে আল্লাহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদেরকে, তথা, সেই তাঁকেও জ্ঞান থেকে অতি অল্প ব্যতীত প্রদান করা হয়নি। এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, যে রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-কে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা না থাকলে আল্লাহ্ তায়ালা এই বিশ্বজাহানই সৃষ্টি করতেন না, আল্লাহ্ তায়ালার অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় সেই রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রদত্ত জ্ঞানও অতি অল্প, আর সেই জ্ঞান দিয়ে সেই তিনিও রূহ্-এর প্রকৃত স্বরূপ কখনোই জানতে পারবেন না। অতএব, আমাদের মত নগণ্য মানুষদেরকে রূহ্ সম্বন্ধে এতটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে, রূহ্ হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম যা তিনি দেহ গঠন সম্পূর্ণ হওয়ার পর জীবিত মানব দেহমধ্যে ফুৎকার করে দেন।

www.pathagar.com

সুতরাং আমরা দেখি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ জীব আর মনুষ্যতের জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী দুই-ই) সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলামে তাই তাদের সৃষ্টিও পৃথকভাবেই বর্ণিত হয়েছে এবং আমিও সেভাবেই বর্ণনা করেছি। আমি আগে মনুষ্যতের জীবের সৃষ্টি সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন তৎপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেছেন। অনন্তর তোমাদের জীবিকার জন্য তদ্বারা ফলপুঞ্জ উৎপন্ন করেছেন।" (১৪ ঃ ৩২),

"এবং আমি প্রত্যেক চেতন পদার্থকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" (২১ ঃ ৩০),

"এবং আল্লাহ্ পানি থেকে সর্ববিধ জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের কতিপয় স্ব-স্ব উদরে ভর দিয়া গমণ করে এবং তাদের কতিপয় পদদ্বয় দ্বারা গমণ করে এবং তাদের কতিপয় চতুষ্পদ দ্বারা গমণ করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করে থাকেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।" (২৪ ঃ ৪৫),

"এবং তিনি চার দিনে তন্মধ্যে (পৃথিবী মধ্যে) উহার উৎপাদিকা শক্তি নির্ধারিত করেছেন।" (৪১ ঃ ১০),

"এবং এরপর তিনি পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করেছেন, তা থেকে তিনি তার পানি ও তার তৃণভূমি বহির্গত করেছেন। এবং তিনি পর্বতসমূহ সুদৃঢ় করেছেন। এ সবই তোমাদের জন্য ও তোমাদের পশুদের জন্য উপকারী।" (৭৯ ঃ ৩০-৩৩)।

কালামে পাকের এইসব আয়াত এবং এই ধরনের আরও কিছু আয়াত শরীফ আছে যা থেকে দেখা যায় যে, জড়বিশ্বের সৃষ্টি এবং পৃথিবীকে জীবজন্তু এবং মানুষের জন্য যথাযথভাবে সম্প্রসারিত করার পর আল্লাহ্ তায়ালা মেঘ সৃষ্টি করে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি নির্ধারণ করেন। তারপর এই পানি থেকেই আল্লাহ্ তায়ালা "সর্ববিধ জীবজন্তু" সৃষ্টি করেন। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তৃণ-লতা ও ফলপুঞ্জের তথা উদ্ভিদের সৃষ্টি করেন, পরে অন্যান্য জীবজন্তুর। অতএব দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা যখন তাঁর পাক জবানে (২৪ ঃ ৪৫) 'সর্ববিধ জীবজন্তু' বলে উল্লেখ করেছেন তখন

www.pathagar.com

জানা যায় যে, যাবতীয় জীবজন্তুই পানি থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে, মানুষ যেহেতু একটি বিশেষ ধরণের জীব, সুতরাং তার সৃষ্টিও পৃথক ধারাতেই হওয়া সম্ভব এবং তাই হয়েছিলও; মানুষ জীব পানি থেকে সৃষ্ট হয়নি। যদিও কোনও কোনও ভাষ্যকার বলেন যে, "মানুষসহ উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীসমূহের ন্যায় ডাঙার প্রাণীসমূহ তাদের ভ্রূণাবস্থার ইতিহাসে মাতৃগর্ভে মাছের ন্যায় আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রদর্শন করে যা তাদের আদি জন্মস্থান ও বাসস্থান পানিতেই ছিল বলে সপ্রমাণ করে।" (দ্রষ্টব্য: আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ আলী, ২১ ঃ ৩০ এবং টীকা নং ২৬৯১)। যাহোক, তাঁদের এ মত সঠিক নয় বলেই মনে হয়। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং যখন "প্রগাঢ় কর্দমের বিশুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা" (১৫ ঃ ২৬, ২৮) এবং "মৃন্ময় পাত্রের ন্যায় বিশুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা" (৫৫ ঃ ১৪) মানুষ সৃষ্টির কথাই বলেছেন–তাকে পানি থেকে সৃষ্টির কথা বলেন নি-তখন মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রমবিবর্তনে সব প্রাণীতে একই রকমের এবং মাছের ন্যায় প্রদর্শিত যে বৈশিষ্ট্যকে বিবর্তনবাদীরা তাদের বিবর্তনবাদের অন্যতম প্রমাণ বলে খাড়া করেন, বিবর্তনবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে আমরা আল কোরআনের ঘোষিত উক্তির বিপরীতে মানুষের ক্ষেত্রেও সেইসব বৈশিষ্ট্যকে বিবর্তনবাদের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে এ কথা স্বীকার করতে পারি না যে, মানুষের সৃষ্টিও প্রথমে পানিতেই হয়েছিল এবং পরে ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষ ডাঙায় উঠে এসেছে। মাতৃগর্ভে অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ন্যায় মানব ভ্রূণেরও ক্রমরূপান্তর হয়, কিন্তু তা হয় খোদার ইচ্ছেতেই এবং তা অন্য কারণে–যার কথা আমরা পরে বলেছি। অতএব, আমাদের বক্তব্য এই যে, মানুষের ব্যতিক্রম বাদে আর সব জীবেরই আদি সৃষ্টি আল্লাহ্ তায়ালা পানি থেকেই করেছিলেন এবং তা সম্ভবত সেই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ হিসাবেই। কারণ সমগ্র কোরআনুল কারীমের কোথায়ও এমন কোনও কথা নেই যাতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রজাতির জীবের দৈহিক গঠন পৃথক পৃথকভাবেই পানিতে সৃষ্টি করে তারপর তাদেরকে প্রাণ দানের মাধ্যমে জীবিত করা হয়েছিল–যেমন বলা হয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে। মানুষের সৃষ্টির কথা যখন আমরা আলোচনা করব তখন দেখতে পাব যে, মাটি দিয়ে মানুষের দেহ গঠন করে তারপর তার প্রাণদান ও অতঃপর তম্মধ্যে রূহ্ ফুৎকারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ সৃষ্টির সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু আর সব জীব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে রকম কিছু বলা হয়নি। বরং ২১ঃ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন যে, 'জীবিত সব কিছু'কে (স্পষ্টতঃ মানুষ বাদে) তিনি পানি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং ২৪ঃ৪৫ নং আয়াতে অতি সুস্পষ্টভাবে তিনি 'সর্ববিধ জীবজন্তু'কেই পানি থেকে সৃষ্টি করার কথাই ঘোষণা করেছেন। ঠিক

www.pathagar.com

ওই একই আয়াতের পরবর্তীতেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন যে, "অতঃপর তাদের কতিপয় স্ব-স্ব উদরে ভর দিয়া গমণ করে এবং তাদের কতিপয় পদদ্বয় দ্বারা গমণ করে এবং তাদের কতিপয় চতুষ্পদ দ্বারা গমণ করে।" সুতরাং দেখা যায় যে, চলনের ব্যাপারে, সৃষ্ট হওয়ার পর থেকে প্রাথমিক অবস্থায় জীবসমূহ "উদরে ভর দিয়া" অর্থাৎ পা ছাড়া চলাফেরা করত–যেমন প্রোটোজোয়া থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের যাবতীয় প্রাণী। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা এইসব জীবের কাউকে দুটি পা প্রদান করেন, যেমন পক্ষীকুল, আবার কাউকে চারটি পা প্রদান করেন যেমন গরু, ঘোড়া ইত্যাদি। (স্মর্তব্য যে, যেহেতু উদ্ভিদও এক প্রকার জীব সুতরাং তারও সৃষ্টি পানি থেকেই হয়েছিল।) সুতরাং আমরা দেখি যে, জীবসৃষ্টির এবং বিভিন্ন প্রকার জীবের জন্মের ব্যাপারে আল কোরআনও এক ধরণের বিবর্তনবাদেরই ইঙ্গিত প্রদান করেন, অবশ্য যদিও এই বিবর্তনবাদ জীব বিজ্ঞানীয় বিবর্তনবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বিবর্তনবাদ কীভাবে ও কোন্ কোন্ দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ থেকে পৃথক সে কথা আমি পরে আলোচনা করবো। আপাতত এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আল কোরআনে ইঙ্গিত প্রদত্ত এ বিবর্তন আপনা আপনি ঘটেনি; এতে আল্লাহ্ তায়ালাই হচ্ছেন "আদি ও অভিনব স্রষ্টা" (২ঃ ১১৭; ৩৫ঃ ১) এবং এর মূল পরিচালকও তিনিই। আর, আল কোরআনের বর্ণনানুযায়ী যাবতীয় জীবের সৃষ্টি আল্লাহ্ তায়ালা করেছিলেন পানিতেই এবং তারপর তিনি স্বয়ং তাঁর অনন্ত জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতা দিয়ে এক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে "বুঁকে হাঁটা" প্রোটোজোয়া ধরনের নিম্নস্তরের জীব থেকে শুরু করে ক্রমশ উচ্চস্তরের দু-পায়ে ও চারপায়ে হাঁটা প্রাণীর সৃষ্টি করেন। এরই এক শাখাকে বিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি উদ্ভিদ কোষে রূপান্তরিত করেন এবং পরে তা থেকেই সমগ্র উদ্ভিদ জগতকে বিবর্তিত করেন। এতে নিম্নস্তরের জীবসমূহের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিও হলো না অথচ উন্নততর জীবেরও জন্ম হলো। আর, জীবজগত এখন যে স্তরে এসে ঠেকেছে তাই-ই সম্ভবত এ বিবর্তনের শেষ পরিণতি; এরপর আর বিবর্তন ঘটবে না, কারণ, রোজ কেয়ামত অতি নিকটবর্তী। অবশ্য আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে এ বিবর্তনকে তিনি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতেও পারেন।

"সর্ববিধ জীবজন্তু পানি থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন", এ কথা দ্বারা এরূপ বোঝা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ্ তায়ালা এদের প্রত্যেককে যার যার স্বরূপে পানিতেই সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারপর তারা যার যার মত ডাঙায় উঠে এসেছিল, অর্থাৎ একটা পাখি, পাখি হিসাবেই পানি থেকে সৃষ্ট হয়ে আকাশে উড়ে উঠেছিল কিংবা একটা গরু গরু হিসাবেই পানি থেকে সৃষ্ট হয়ে ডাঙায় উঠে

www.pathagar.com

এসেছিল। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালার অনন্ত শক্তির কাছে যদিও সবই সম্ভব তবুও পাখিকে পাখি, গরুকে গরু এবং অন্যান্য যাবতীয় জীবজন্তুকে সেই সেই জীবজন্তু হিসাবে-ডাঙায়ই হোক আর পানিতেই হোক–সৃষ্টি করে থাকলে আল্লাহ্ তায়ালা তা স্পষ্ট করে সেইভাবেই বলতেন যেমন তিনি বলেছেন মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে। তিনি যখন সে ভাবের কিছুই বলেন নি বরং সর্ববিধ জীবজন্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করার কথাই বলেছেন এবং পরপরই উদরে ভর দিয়ে হাঁটা থেকে শুরু করে ক্রমশ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ দিয়ে হাঁটার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তখন স্পষ্টত বোঝা যায় যে, সর্ববিধ জীবজন্তুকে আল্লাহ্ তায়ালা পৃথক পৃথকভাবে সেই সেই জীবজন্তু হিসাবেই পানি থেকে সৃষ্টি না করে তাদের আদি পূর্ব পুরুষ হিসাবে একটি আদিম এবং অবশ্যই এক কোষী জীবকে সৃষ্টি করেছিলেন পানি থেকে এবং তারপর, আমি আগেই যেমন বলেছি, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর অনন্ত জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতা দিয়ে সেই এককোষী জীব থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বহুকোষী জীব সৃষ্টি করেছেন পদবিহীন বুকে হাঁটা জীব থেকে শুরু করে চতুষ্পদবিশিষ্ট উচ্চস্তরের প্রাণী পর্যন্ত সবই। সেই আদিম জীবেরই একটি শাখাকে তিনি তার নিজ কুদরতে উদ্ভিদে রূপান্তরিত করেন। পৃথিবীর বুকে প্রাণীজগতের সৃষ্টি ও বিবর্তনই যে তিনি আগে করেছিলেন এ কথা আল কোরআনের ৭৯ ঃ ৩০-৩৩ নং এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতসমূহ থেকেও স্পষ্ট। বিজ্ঞানও সর্বাগ্রে উদ্ভিদের উদ্ভব হয়েছিল বলেই বলে। "ফলপুঞ্জ" উৎপাদক সপুষ্পক উদ্ভিদ পর্যন্ত উচ্চস্তরের উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালা প্রাণী জগতের সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্পন্ন করেন। প্রাণী জগতের খাদ্যবস্তু ও সমস্ত জীবের শ্বাস ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন প্রস্তুতের কারখানা স্বরূপ সবুজ উদ্ভিদ ও ফলশস্যের সৃষ্টি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা প্রাণীর সৃষ্টি বা বিবর্তন শুরু ও সম্পূর্ণ করেন নি। তারপর সর্বশেষে আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করেন মানুষকে-সম্পূর্ণ এক পৃথক পদ্ধতিতে–যাকে দুনিয়ায় পাঠানোর জন্যই আল্লাহ্ তায়ালার এত আয়োজন। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রকার জীব-কূলের মধ্যে মানুষই সর্ব কনিষ্ঠ।

এবার মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে আল কোরআন কি বলেন সেই কথা বলা যাক। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কালামে পাক-এ বলেন,

"এবং যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে বলেছিলেন নিশ্চয় আমি দুনিয়ার বুকে প্রতিনিধি পাঠাতে চাই, তারা বলেছিল তুমি কি তাতে এমন কাউকে পাঠাতে চাও যারা সেখানে ঝগড়া ফাসাদ ও রক্তপাত করবে?" (২ ঃ ৩০)

www.pathagar.com

এটাই ছিল দুনিয়ার বুকে মানুষ পাঠানো সম্পর্কে ফেরেশ্‌তাদের কাছে আল্লাহ্ তায়ালার প্রস্তাবনা। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নহেন এবং যেহেতু বিশ্ব সৃষ্টি বা তার পরিচালন ব্যাপারে ফেরেশ্‌তারা আল্লাহ্ তায়ালার কোনও শরীক নয়, তারা নিছক তাঁর হুকুম বরদার মাত্র, সুতরাং ফেরেশ্‌তাদের কাছে এরূপ প্রস্তাবনার তাঁর কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবুও তিনি সম্ভবত পার্শ্ববর্তীদের সঙ্গে "কার্য সম্বন্ধে পরামর্শ করার" (৩ ঃ ১৫৯) শিক্ষা মানুষকে দেয়ার জন্যই ফেরেশ্‌তাদের কাছে এ প্রস্তাবের মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাদেরকে একটা মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন এবং ফেরেশ্‌তারাও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ্ তায়ালাকে ওরূপ সৃষ্টিতে নিরুৎসাহিত করতে চেয়েছিল এবং প্রস্তাবিত সেই সৃষ্টি কর্তৃক ঝগড়া ফাসাদ ও রক্তপাতের আশংকার কথা ব্যক্ত করেছিল। অবশ্য আল্লাহ্ যা জানেন ফেরেশ্‌তারা তা জানে না (২ ঃ ৩০) জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সে কথা মানেননি; নিজ ইচ্ছায় অটল থেকেছেন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এখন, ফেরেশ্‌তারা ভবিষ্যৎ জ্ঞানী নয়। তাই আল্লাহ্ তায়ালার সেই প্রস্তাবিত সৃষ্টি যে ঝগড়া ফাসাদ ও রক্তপাত করবে এটা তারা কী করে বুঝল বা জানল? সম্ভবত তাদের অতীত অভিজ্ঞতা ছিল। তাহলে অবশ্যই প্রস্তাবিত মানুষের আগেও পৃথিবীতে আরও মানব বা তদনুরূপ জাতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা ঝগড়া ফাসাদ ও রক্তপাত করেছিল যা ফেরেশ্‌তারা দেখেছিল এবং যারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ্ তায়ালার কোপে পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত সত্য সত্যই তা যে হয়েছিলও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা থেকেও তা পাওয়া যায় যেখানে তিনি বর্তমান মানব জাতির পূর্ববর্তী জ্বেন জাতির পূর্বেও জ্বান, বানু, তাম, রম প্রভৃতি জাতির অস্তিত্ব ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। এমাম আহমাদ বাকের প্রমূখ অনেকের মতে, বর্তমান মানব জাতি যে আদম (আঃ)-এর বংশধর তাঁর আগেও বহু আদমের সৃষ্টি হয়েছিল; এই আদম (আঃ) হচ্ছেন সর্বকনিষ্ঠ। যাহোক, আজ আমরা কোটি কোটি বা লক্ষ লক্ষ বছর আগের পুরোনো যে সব মানবাকৃতির কংকাল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাই তারা সম্ভবত এই সব জাতীয় মানুষই ছিল। (মাওলানা আব্দুল হাকিম ও মাওলানা আলী হাসান কৃত তফসীর, পৃষ্ঠা-১৬-১৭ দ্রষ্টব্য)।

লক্ষ্যণীয় যে, উদ্ধৃত ২ ঃ ৩০ নং আয়াতে দুনিয়ার বুকে খলিফা পাঠানোর প্রস্তাবনায় প্রস্তাবকারী হিসাবে 'আল্লাহ' শব্দের উল্লেখ করা হয়নি, উল্লেখ করা হয়েছে 'রব' শব্দের। অর্থাৎ প্রস্তাবিত সেই সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ হবে দুনিয়ার বুকে 'রব'-এর খলিফা, 'আল্লাহ'-এর খলিফা নয়। আল্লাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার

www.pathagar.com

'জাতি (Essential)' নাম, সে নামের জন্য তিনি তাঁর সৃষ্টির কাছ থেকে এবাদত প্রাপ্তির হক্‌দার। আর 'রব' হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার একটি 'গুণ' বাচক (Attributive) নাম যার জন্যে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন। আল্লাহ্‌র প্রস্তাবনা এই ছিল যে, প্রস্তাবিত মানুষ হবে দুর্নিয়ার বুকে তাঁর রবুবিয়াতের প্রতিনিধি-তাঁর উলুহিয়াতের নয়। প্রতিনিধির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরংকুশ ও সার্বিক নয়, তা তার মূল মালিক কর্তৃক নির্ধারিত ও সীমিত। দুনিয়ার বুকে মানুষের কাজ হবে বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ ও সামর্থের মূল মালিক আল্লাহ্ কর্তৃক তার জিম্মাদারীত্বে প্রদত্ত সীমিত সম্পদ ও সামর্থ দিয়ে তার নিজেকেসহ তার পার্শ্ববর্তী আর সব কিছুকে প্রতিপালন করা–তাদের কারও কাছ থেকে সরাসরি এবাদত বা এবাদতী আনুগত্যের দাবী করা নয়। রাবক্ষুল আ'লামিনের এই প্রতিনিধিই হচ্ছে মানুষ-যার সর্বপ্রথম জন হচ্ছেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হজরত আদম (আঃ)। এই প্রথম মানুষ হজরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কালামে পাকে বলেন,

"তিনিই তোমাদিগকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (৬ ঃ ২),

"নিশ্চয় আমি মানুষকে প্রগাঢ় কর্দমের বিশুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি।" (১৫ ঃ ২৬),

"এবং যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলেন নিশ্চয় আমি প্রগাঢ় কর্দমের বিশুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করব। অনন্তর যখন আমি তাকে সংগঠিত করি এবং তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা (রূহ্) প্রবিষ্ট করাই তখন তোমরা তার সমক্ষে সেজদাকারী হ'য়ো।" (১৫ ঃ ২৮-২৯),

"নিশ্চয় আমি মানুষকে নির্বাচিত মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি।" (২০ ঃ ১২),

"তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তোমরা মানবরূপে সম্প্রসারিত হচ্ছ।" (৩০ ঃ ২০),

"এবং তিনিই মৃত্তিকা থেকে মানব সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন।" (৩২ ঃ ৭),

www.pathagar.com

"যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলেন যে, নিশ্চয় আমি মৃত্তিকা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করব। অনন্তর যখন আমি তার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেছিলাম এবং তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা (রূহ্) ফুৎকার করেছিলাম, তখন তদুদ্দেশ্যে প্রণতভাবে পতিত হও।" (৩৮ ঃ ৭১-৭২) এবং

"তিনি মৃন্ময় পাত্রের ন্যায় বিশুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" (৫৫ ঃ ১৪)

এইসব এবং ইত্যাকার বহু আয়াত শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ সৃষ্টির কথা বলেছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি মাটি দ্বারাই মানুষকে সৃষ্টি করে তৎপর তার মধ্যে রূহ্ ফুৎকার করার কথা বলেছেন; আর সে মাটিও যে সে মাটি নয়, 'নির্বাচিত' এবং 'প্রগাঢ় কর্দমের বিশুষ্ক মাটি'। এ স্থলে নির্বাচিত কথাটির উল্লেখ সম্ভবত এ কারণে যে, প্রত্যেক মানুষের নাভিতে, যে স্থানে তার কবর হবে সেই বিশেষ স্থানের মাটি থেকে, অর্থাৎ যে স্থানের মাটিতে তার দেহ মিশে যাবে সেই স্থানের মাটি তার দেহের নাভিতে থাকবে, আর সেই হিসাবেই ওটা ওই মানুষটির দেহের জন্য 'নির্বাচিত' মাটিই। মাতৃগর্ভে সন্তানের দেহ গঠন সম্পর্কিত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ)-এর একটি হাদীসেও এর উল্লেখ আছে।

যাহোক, আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম মানুষ হজরত আদম (আঃ)-এর দেহ পৃথিবীর বুকে যে স্থানে তাঁর কবর হবে সেই স্থান থেকে মাটি আনিয়ে সেই 'নির্বাচিত' মাটি দিয়ে "স্বীয় হস্ত দ্বারা" (৩৮ঃ ৭৫) "অত্যুৎকৃষ্ট আকৃতিতে" (৯৫ ঃ ৪) গঠন করেছিলেন। (এখানে হস্ত বলতে অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতী হস্তকেই বুঝতে হবে, কারণ যেহেতু তিনি নিরাকার এবং "কিছুই তাঁর মত নয়" (৪২ ঃ ১১), সুতরাং মানবীয় হাতের ন্যায় কোনও হাত থাকা থেকে তিনি পবিত্র।) তারপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর অনন্ত কুদরতে সেই দেহের মধ্যে জীবন দান করেন এবং তারপর তাতে তাঁর নিজ রূহ্ থেকে ফুৎকার করেন এবং তাতে করে হজরত আদম (আঃ) জীবিত হয়ে ওঠেন এবং এভাবে একজন পূর্ণ মানুষ ও তাঁর 'রব'-এর খলিফায় পরিণত হন। ইহাই আল কোরআনে বর্ণিত প্রথম মানুষ হজরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গ।

লক্ষ্যণীয় যে, হজরত আদম (আঃ)-এর দেহ গঠনের জন্য যে দুনিয়ার বুকে তার কবর হবে সেই দুনিয়ার মাটিই ব্যবহার করা হয়েছিল। যদিও তাঁর সে

www.pathagar.com

দেহ গঠন করা হয়েছিল বেহেশ্‌তেই। এ থেকে এও বোঝা যায় যে, হজরত আদম (আঃ)-এর জন্মস্থান এবং প্রাথমিক বাসস্থান বেহেশ্‌ত হলেও তাঁর এবং তা থেকে তাঁর বংশধর মানুষদের আসল বাসস্থান ও কর্মস্থান এবং তাদের সকলেরই দেহের মিশে যাওয়ার স্থান হবে দুনিয়াতেই। হজরত আদম (আঃ) এবং সুতরাং মানুষেরও আসল বাসস্থান এবং কর্মস্থান যে দুনিয়াতেই হবে এবং তা যে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাও জানতেন তা তাঁর, "নিশ্চয়ই আমি 'দুনিয়ার বুকে' প্রতিনিধি পাঠাব" (২ ঃ ৩০)-এই উক্তি থেকেও বোঝা যায়। কাজেই, আল্লাহ্ তায়ালা তবুও সম্পূর্ণ জেনেশুনেই কেন যে আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) ও আদি মাতা হজরত হাওয়াকে একটি বিশেষ গাছের কাছে পর্যন্ত যেতে নিষেধ করলেন (২ঃ ৩৫) এবং সেই নিষেধ অমাণ্য করার জন্য আবার তাঁদেরকে "দোষী" (?) করলেন এবং সেই "দোষে" তাঁদেরকে বিভ্রান্তকারী শয়তান (২ ঃ ৩৬) সহ তাঁদের "সবাই"কে (২ঃ ৩৮) বেহেশ্‌ত্ থেকে বহিষ্কার করে দুনিয়ায় ফেলে দিলেন (২ ঃ ৩৬, ৩৮) এবং তিনশত বছর পর্যন্ত বাবা আদম (আঃ) ও মা হাওয়াকে বিচ্ছিন্ন রেখে অনুতাপ, অনুশোচনা ও বিরহের আগুনে দগ্ধ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত আবার তাঁর নিজেরই শিখানো (২ঃ ৩৭) মোতাবেক আমাদের রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নাম সহযোগে দোয়া করার মাধ্যমে তাঁদেরকে ক্ষমা করলেন এবং উভয়ের দ্বারা দুনিয়া আবাদের ব্যবস্থা করে দিলেন–এসব কথার রহস্য একমাত্র সে রহস্যের স্রষ্টা মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না! হজরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়া যদি আল্লাহ্ তায়ালার সেই নিষেধটি মেনেই চলতেন তাহলে তো আর তাঁদের কোনও দোষও (?) হতো না এবং আল্লাহ্ তায়ালাও তাঁদেরকে বেহেশ্‌ত্ থেকে বহিষ্কার করে দুনিয়ায় পাঠানোর কোনও কারণও পেতেন না এবং তখন, "নিশ্চয় আমি দুনিয়ার বুকে প্রতিনিধি পাঠাব", আল্লাহ্ তায়ালার এই উক্তি সত্যে পরিণত হতো না–অথবা অন্যভাবে তাঁদেরকে তখন দুনিয়ায় পাঠাতে হতো। কিন্ত তা হওয়ার ছিল না। কারণ, আদম (আঃ) সৃষ্টির বহুকাল পূর্ব থেকেই তক্‌দীরে এরূপই লিপিবদ্ধ ছিল এবং আল্লাহ্ তায়ালা তা জানতেনও এবং তাই যাবতীয় ঘটনা সেই তক্‌দীর মোতাবেকই ঘটেছিল–অন্যথা হওয়ার উপায় ছিল না। চতুর্থ আসমানে হজরত মুসা (আঃ) ও হজরত আদম (আঃ)-এর একদিনকার কথোপকথনের মধ্যেও আমরা সে কথাটি জানতে পারি। তাছাড়া, আল্লাহ্ তায়ালার কাজ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করার অধিকার তো কারও নেই-ই। (২১ ঃ ২৩)

www.pathagar.com

যাহোক, আল্লাহ্ তায়ালা আদি পিতা হজরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর আদম বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথমে তাঁর দেহ থেকেই আদি মাতা হজরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন,

"হে লোকসকল তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী বিস্তৃত করেছেন।" (৪ ঃ ১),

"এবং তিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (৬ ঃ ৯৮),

"তিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন।" (৭ ঃ ১৮৯) এবং

"তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন; তৎপর তা থেকে তার সহধর্মিনী করেছেন।" (৩৯ ঃ ৬)

যে প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্ তায়ালা হজরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছিলেন সেই জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় না গিয়ে দুনিয়ার বুকে মানব জাতির সম্প্রসারণের জন্য শুধুমাত্র "হও" (২ ঃ ১১৭) এই কথা দ্বারাই তো তিনি দ্রুত মানব বংশ বিস্তারের সে প্রয়োজনের সময়ে কোটি কোটি বা তার চাইতেও বেশি অগণন মানুষকে মূহূর্তমধ্যে বা ক্রমান্বয়ে তাঁর যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এর আগে হজরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করতে গিয়েও তিনি সে পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, অবশ্য আল্লাহই সঠিক জানেন, সে 'অলৌকিক' ও মূহূর্তমধ্যে সৃষ্টির ব্যাপারটি মানুষ তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারত না এবং তাই সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপারটিকেই তারা 'স্বয়ং-সৃষ্ট' এবং প্রাকৃতিক নিয়মে আকস্মিকভাবে "উদ্ভূত" বলে বিশ্বাস করতো, এখনো যেমন এক শ্রেণীর প্রকৃতিবাদী মানুষেরা করে থাকে যারা জড় জগত এবং জীব জগতের সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপারটিকেই স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ 'আপনা আপনিই উদ্ভূত' বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা 'সৃষ্টি' শব্দটিকেই ব্যবহার করতে নারাজ, কারণ তাতে 'স্রষ্টার' উপস্থিতির ধারণা প্রচ্ছন্ন থাকে; তাঁরা এ সবকে তাই বলেন 'উদ্ভূত'-Evolved, এবং প্রক্রিয়াটিকে তাই বলেন উদ্ভব বা Evolution-সৃষ্টি বা Creation নয়। যাহোক, আল্লাহ্ তায়ালা এই কারণেই

www.pathagar.com

"হও" কথা দ্বারা অলৌকিক পদ্ধতিতে মানুষ-শুধু মানুষ কেন কোনও জীবকেই এবং তার বংশধরদেরকেও মূহূর্তমধ্যে সৃষ্টি করেননি, সৃষ্টির যে পদ্ধতিটি মানুষ তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা বিশ্লেষণাদি দিয়ে বুঝতে পারে সেই দীর্ঘ গাঠনিক ক্রম ও পদ্ধতিই তিনি অনুসরণ করেছেন। আরও একটি কারণ আছে এবং তা হচ্ছে এই যে, মা হাওয়া এবং অন্যান্য মানুষকে যদি আল্লাহ্ তায়ালা, যে কোনও পদ্ধতিতেই হোক, পৃথক পৃথকভাবেই সৃষ্টি করতেন তাহলে মানুষে মানুষে যে প্রেম-প্রীতি ও একাত্মতাবোধ, যা সুস্থ ও শান্তিময় পারিবারিক ও সমাজজীবনের ভিত্তি তা মানুষের মধ্যে থাকতো না বা গড়ে উঠত না। এ সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

"এবং তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের জন্য সহধর্মিনী সকল সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের থেকে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন।" (৩০ ঃ ২১)

অবশ্য মনুষ্যেতর জীব জগতে যদিও আমরা পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও সহানুভূতির পরিবর্তে পারস্পরিক হিংস্রতা ও জিঘাংসাও লক্ষ্য করি, এমন কি, বাঘ, কুমীর প্রভৃতি প্রাণীকে আপন সন্তানকে পর্যন্ত খেয়ে ফেলতেও দেখি। কিন্তু মানুষতো বাঘ-কুমীরের মত কোনও সাধারণ জীব নয়, সে হচ্ছে রূহ্ প্রদত্ত জীব-সে তার 'রব'-এর প্রতিনিধি। তাই তার ও অন্যান্য জীব-জন্তুর ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হতেই বাধ্য। যাহোক, এসব কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা অন্য পন্থা অবলম্বন না করে আরও মানুষ সৃষ্টির প্রাথমিক ধাপ হিসাবে হজরত আদম (আঃ)-এর দেহ থেকেই হজরত আদম (আঃ)-এর বিপরীত লিঙ্গ বিশিষ্টা মা হাওয়ার সৃষ্টি করেন। একটি প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী সৃষ্টির এ অযৌন পদ্ধতি জীব জগতের বহু জীবের মধ্যেই আল্লাহ্ তায়ালা এখনো চালু রেখেছেন। একটি এ্যামিবাকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুটো এ্যামিবার সৃষ্টি করেন, একটা হাইড্রার দেহ থেকে তিনি প্রথমে একটা কুঁড়ির সৃষ্টি করেন, তারপর সেই কুঁড়িটিকেই মূল হাইড্রার দেহ সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্রাকার হাইড্রায় পরিণত করে ক্রমশ বড় করতে করতে এক সময়ে মূল হাইড্রার দেহ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র ও সন্তান হাইড্রায় পরিণত করেন এবং তারপর সে পৃথকভাবে বাঁচতে ও বংশ বিস্তার সহ অন্যান্য জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ পরিচালিত করতে শুরু করে। কোনও কোনও উদ্ভিদেও আল্লাহ্ তায়ালা বংশবিস্তারের এ পদ্ধতি চালু রেখেছেন। হজরত হাওয়াকেও আল্লাহ্ তায়ালা হজরত আদম (আঃ)-এর দেহ থেকে হয়তো (অবশ্যই আল্লাহ্ই ভাল

www.pathagar.com

জানেন) এরূপ কোনও অযৌন পদ্ধতিতেই সৃষ্টি করেছিলেন, আর একটি স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেননি–যাতে তাঁদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সহানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হয় যা–আমি আগেই বলেছি-সুস্থ ও শান্তিময় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি। তাছাড়া তখনো তো বাবা আদমের বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্টা আর দ্বিতীয় মানবী ছিলই না, সুতরাং তখন যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারের কথাই আসে না। আরও লক্ষ্যণীয় যে দ্বিতীয় মানুষ মা হাওয়াকে আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করেছিলেন একজন মানবী হিসাবে হজরত আদম (আঃ)-এর বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্টা করে যাতে অতঃপর খোদার ইচ্ছেয় তাঁরা নিজেরাই পরস্পরের সহযোগে যৌন পদ্ধতিতে আরও মানব সন্তানের জন্মদান করে মানব বংশকে পৃথিবীতে খোদার ইচ্ছেমাফিক সম্প্রসারিত করে দিতে পারেন। বস্তুতঃ মানুষের বংশবিস্তার প্রক্রিয়া একটি অতীব জটিল ও আশ্চর্য্যজনক এবং বিস্ময়কর প্রক্রিয়া এবং আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি কৌশলের এক অপূর্ব নিদর্শন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

"হে মানবগণ, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ভয় কর যিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী বিস্তৃত করেছেন।" (৪ ঃ ১),

"এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য সহধর্মিনী সকল সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পত্নীগণ থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্র সকল সৃষ্টি করেছেন।" (১৬ ঃ ৭২),

"এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত করেছেন।" (১৬ ঃ ৭৮),

"হে মানবগণ, যদি তোমরা পূনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হও, তবে নিশ্চয় আমি এজন্য তোমাদেরকে মাটি থেকে, তৎপর শুক্র থেকে, তৎপর রক্তপিণ্ড থেকে, তৎপর মাংসপিণ্ড থেকে পূর্ণাকৃতি ও অসম্পূর্ণাকৃতি সৃষ্টি করেছি যেন আমি তোমাদেরকে সুবিদিত করি; এবং যাহাকে ইচ্ছা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জরায়ু মধ্যে অবস্থিতি করাই, তৎপর আমি তাকে শিশুরূপে বহির্গত করি।" (২২ ঃ ৫),

"এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে নির্বাচিত মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি; তৎপর আমি তাকে এক সুরক্ষিত স্থানে শুক্রবিন্দুরূপে সংস্থাপিত করেছি; অনন্তর

www.pathagar.com

শুক্রবিন্দুকে ঘনীভূত শোনিত করেছি, তৎপর ঘনীভূত শোনিতকে মাংসপিণ্ড করেছি, তৎপর মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জ করেছি, তৎপর অস্থিপুঞ্জকে মাংসপিণ্ড করেছি, অবশেষে আমি তাকে 'চরম সৃষ্টি' পরিণত করে দিয়েছি।" (২৩ ঃ ১২-১৪),

"এবং তিনিই মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সূত্রপাত করেছেন। তৎপর তিনি অবজ্ঞাত সলিলের সারাংশ থেকে তার বংশধর করেছেন অনন্তর তাকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন এবং তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করেছেন এবং তোমাদের জন্য চক্ষুসকল, কর্ণসকল ও অন্তঃকরণসমূহ করেছেন।" (৩২ ঃ ৭-৯),

"তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জননীদের গর্ভে তিনটি অন্ধকার পর্দার মধ্যে সৃষ্টির পর সৃষ্টিতে সৃষ্টি করেছেন।" (৩৯ ঃ ৬),

"তবে কি সে জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত একবিন্দু শুক্রমাত্র নহে? তৎপর সে শোনিত পিন্ড হয়েছিল; অতঃপর তিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন; তৎপর তাকে পূর্ণাঙ্গ করেছিলেন।" (৭৫ ঃ ৩৭-৩৮)

উপরে আল কোরআন থেকে এতগুলো আয়াত আমি এই কারণে উদ্ধৃত করেছি যে, সামগ্রিকভাবে এই সব আয়াতের অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে মাটি দ্বারা প্রথম মানব হজরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি থেকে শুরু করে তাঁরই দেহ থেকে প্রথম মানবী মা হাওয়ার সৃষ্টি এবং তৎপর উভয় থেকে তাঁদের বংশধর মানবজাতির সৃষ্টির একটা ইতিহাস আমরা অতি সুন্দরভাবে পেতে পারি। এতে জরায়ু গর্ভে শুক্রবিন্দুর নিক্ষেপ থেকে শুরু করে ২৭০ বা ২৮০ দিনের "এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জরায়ু মধ্যে" ভ্রুণাবস্থা থেকে মানব শিশুর জন্ম পর্যন্ত ক্রমবিকাশের সমগ্র পর্যায়টিকেও আল্লাহ্ তায়ালা এত সুন্দর ও সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বিশ শতকের শেষ দশকের আধুনিক ভ্রুণ বিজ্ঞানও সে বর্ণনা পড়ে তাজ্জব বনে যেতে এবং তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আল কোরআন সত্যি সত্যি মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্ তায়ালারই কালাম–কোনও মানুষের কথা নয়।

www.pathagar.com

তিন

আল কোরআন যে কালে অবতীর্ণ হয়েছিল সে কালের মানুষেরা, এমন কি "সে কালের বিজ্ঞান" পর্যন্তও, শুক্রকীট, ডিম্বাণু প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানতো না বলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বর্ণনায় সে সবের উল্লেখ না করে তখনকার মানুষের নিকট পরিচিত শোনিত, শোনিত পিণ্ড; মাংস, মাংসপিণ্ড, অস্থি, অস্থিপুঞ্জ প্রভৃতি শব্দসমূহ ব্যবহার করেছেন। এই সব অতি পরিচিত শব্দযোগে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের সৃষ্টি ও মাতৃগর্ভে মানবভ্রূণের ক্রমবিকাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, প্রগাঢ় কর্দমের বিশুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা তিনি প্রথম মানুষ হজরত আদম (আঃ)-এর জড় দেহ নির্মাণ সম্পন্ন করে তাতে অন্যান্য জীবের মতই জীবন দান করেন এবং সেই জীবিত দেহের মধ্যে স্বীয় রূহ্ থেকে ফুৎকার করেন এবং তার ফলে হজরত আদম (আঃ) তাঁর 'রব' এর খলিফায় পরিণত হন এবং ফেরেশ্তাদের পর্যন্ত "সেজ্দা"র হকদার হন। অতঃপর আদম (আঃ)-এর বংশবিস্তারের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর অসীম কুদরতে সম্পূর্ণ অযৌন পদ্ধতিতে আদম (আঃ)-এর দেহ থেকে তাঁর সহধর্মিনী মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা আদি পিতা আদম (আঃ) এবং আদি মাতা হাওয়ার মাধ্যমে যৌন পদ্ধতিতে মানুষের বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা ও ধারা সৃষ্টি করে দেন-যে ধারা এখনো চালু আছে মানুষসহ অন্যান্য উচ্চতর প্রাণী জগতে। অবশ্য অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, মানুষের ক্ষেত্রে প্রতি তিন শত একুশ কোটি আটাশ লক্ষ গর্ভের মধ্যে একটি গর্ভ অপুংজনি-অর্থাৎ পিতা ছাড়াই হতে পারে। এছাড়া নিম্নশ্রেণীর একজাতের বিড়াল ও এক ধরনের ধবধবে সাদা বেজীর ডিম্বাণু ও শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হওয়া ছাড়াই নিষিক্ত হওয়ার মতই বিভক্ত হতে থাকে। গবেষণায় কোনও কোনও শ্রেণীর শশকের এরূপ অপুংজনি গর্ভের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে, যেহেতু সন্তানের দেহের কোষে পিতার দিক থেকে আগত কোনও পুংলিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম থাকে না সুতরাং শতকরা নিরানব্বই ভাগ সন্তানই কন্যাসন্তান হয় এবং যে একভাগ সন্তান পুত্র সন্তান হয় তারও বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি-যদিও ক্বচিৎ দু-একটা সুস্থ্য ও স্বাভাবিকও হতে পারে। যাহোক যদি কখনো এমন হয় তবে এই বিরল ব্যতিক্রমই আল্লাহ্ তায়ালার অসীম কুদরত ও তাঁর সর্বশক্তিমানত্বেরই সাক্ষ্য বহন করে। যথা বিনা পিতায় মা মরিয়মের গর্ভে হজরত ইসা (আঃ)-এর জন্ম।

www.pathagar.com

এ স্থলে, উদ্ধৃত ৩২ ঃ ৮ নং আয়াতটি একটু বিশদ আলোচনার দাবীদার। এই আয়াত শরীফে মানুষের সন্তান জন্ম ও তার বংশগতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

"অতঃপর তিনি অবজ্ঞাত সলিলের বিশুদ্ধ সার অংশ হইতে তাহার বংশধর (বংশ ধারা) সৃষ্টি করেছেন।" (৩২ ঃ ৮)

এখানে 'মায়েম মাহিন' বা অবজ্ঞাত সলিল বলতে স্পষ্টত পুরুষের বীর্য এবং 'নাস্‌লাহু' বলতে তার (মানুষের) বংশধর বা বংশ ধারাকেই বুঝানো হয়েছে; আর আয়াতে উল্লেখিত 'সোলালাতেন' শব্দের অর্থ হচ্ছে উক্ত বীর্যের 'বিশুদ্ধ সার অংশ'। আয়াত শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা যা বলেন তার সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের বংশধর সৃষ্টি করেছেন এবং তার বংশধারা বা বংশগতিকে বাহিত করেছেন মানুষের সমগ্র বীর্যের এক বিশুদ্ধ সারভাগ দ্বারা। আমরা জানি যে, কোন পদার্থের সারভাগ বলতে সেই পদার্থের যেটা একেবারে সার বা নির্য্যাস এবং কার্যকর অংশ সেটাকেই বুঝায় এবং সেই সার অংশেরও যেটুকু আবার একেবারে খাঁটি ও অকৃত্রিম 'বিশুদ্ধ সার অংশ' বলতে তাকেই বুঝানো হয়, আর সেটা যে অবশ্যই সমগ্র পদার্থটির একেবারে কল্পনাতীত সামান্যতম একটা অংশ তা বোধ হয় আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। সুতরাং আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের বীর্যের একটা কল্পনাতীত সামান্যতম সার অংশের মাধ্যমে তার বংশধর সৃষ্টি ও তার বংশগতিকে বাহিত করেন; এ কাজে তিনি তার সবটুকু বীর্যকে ব্যবহার করেন না যেমন তখনকার দিনের মানুষদের ধারণা ছিল। আধুনিক প্রজনন বিদ্যার সাহায্যে কথাটি বুঝে দেখা যেতে পারে।

আধুনিক প্রজনন বিদ্যার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত সত্য এই যে, সন্তান জন্মদানের জন্য নারীর যে একটিমাত্র পরিপক্ক ডিম্বাণু তার প্রতি ঋতুচক্রে তার ডিম্বাশয় ফেটে বের হয়ে আসে সেটিকে নিষিক্ত করার জন্য পুরুষের একটিমাত্র শুক্রকীট প্রয়োজন; এবং তাও আবার সমগ্র শুক্রকীটটি নয়, মাথা, ঘাড়, দেহ ও লেজ-এই চার অংশে বিভক্ত শুক্রকীটটির শুধু মাথাটি মাত্র–যে মাথাই হচ্ছে তার প্রাণকেন্দ্র এবং যা নাকি সমগ্র শুক্রকীটটির অর্ধাংশের মত। ডিম্বাণুর দেয়াল ভেদ করে এই মাথা বা প্রাণকেন্দ্রটি ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র ঘাড়সহ তার

www.pathagar.com

সমগ্র দেহ ও লেজটি খসে ডিম্বাণুর বাইরে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর দেয়ালটিও অন্য শুক্রকীটের জন্য অভেদ্য ও অপ্রবেশ্য হয়ে যায়, যার কারণে দ্বিতীয় আর একটি শুক্রকীটও ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। অতঃপর ডিম্বাণুর প্রাণকেন্দ্র ও প্রবিষ্ট শুক্রকীটের প্রাণকেন্দ্র পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এবং তাদের প্রত্যেকের ২৩টি করে ক্রোমোজোমসমূহের নবতর বিন্যাসের মাধ্যমে ৪৬ ক্রোমোজোম বিশিষ্ট একটি সন্তান কোষ উৎপন্ন করে। (উল্লেখ্য যে মানবদেহ কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যাও ৪৬-ই) এটাই নিষেক ক্রিয়া। অতঃপর এই সন্তান কোষটিই স্বাভাবিক অবস্থায় ২৭০/২৮০ দিনের মধ্যে যথাযথ বিভক্তি, বৃদ্ধি ও পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সন্তান হিসাবে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়। যাহোক এই নিষেক ক্রিয়ার কৌশল থেকে আমরা এটাই দেখতে পাই যে, এতে পুরুষের দিক থেকে যা অংশগ্রহণ করে তা হচ্ছে একটি মাত্র শুক্রকীটের কেবলমাত্র মাথাটি-যা সমগ্র শুক্রকীটটির একটা অংশ–মোটামুটিভাবে তার অর্ধাংশ মাত্র-এবং যে শুক্রকীটটিও আবার পুরুষের একবারের সবটুকু বীর্যের একটা নগণ্য অংশমাত্র। (এটা যে কত অংশ তার একটা মোটামুটি হিসাব আমরা পরে দেখিয়েছি।) প্রজনন বিদ্যা আরও বলে যে, বংশগতির যে ধারা পিতামাতা থেকে সন্তানে বর্তায় তা বাহিত হয় পিতামাতার জনন কোষে অবস্থিত জীন (Gene)-এর মাধ্যমে। এই জীনগুলো থাকে কোষের প্রাণকেন্দ্রের ক্রোমোজোমসমূহের মধ্যে–শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উভয়ের মধ্যেই যাদের সংখ্যা ২৩টি করে। স্মর্তব্য যে, জীনগুলো বিশেষ এক ধরণের DNA (ডিঅক্সিরিবো নিউক্লিয়িক এসিড) যারা কোষের মধ্যে থাকে বিপূল পরিমাণে এবং যারাই কোষের যাবতীয় কাজ পরিচালিত করে। সবগুলো DNA-ই যদি জীব হিসাবে কাজ করত তাহলে কোষে এদের সংখ্যা হতো ২০ লক্ষ, কিন্তু তা করে না। বংশগতির বাহক হিসাবে কাজ করে ৩০,০০০ এর মত অত্যাবশ্যক জীনের মধ্যে থেকে মাত্র কিছু সংখ্যক। DNA-গুলো থাকে প্রাণকেন্দ্রের মধ্যে অথচ কোষের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয় প্রাণকেন্দ্রের বাইরে সাইটোপ্লাজ্‌ম্-এ। DNA-রা কীভাবে সে সব কাজ পরিচালিত করে? তারা তা করে RNA (রিবোনিউক্লিয়িক এসিড) নামক আর এক প্রকার নিউক্লিয়িক এসিডের মাধ্যমে। প্রয়োজনের মূহূর্তে DNA-রাই RNA-গুলোকে সৃষ্টি করে এবং তাদের মাধ্যমেই যে 'সংকেত' (Code) পাঠায় সেই সংকেত অনুসারেই সাইটোপ্লাজ্‌ম্-এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়, আর এভাবেই সমস্ত কোষের কাজ এবং সম্মিলিতভাবে সমগ্র জীবদেহের কাজ চলে। সংকেতগুলো DNA-এর মধ্যে পূর্ব থেকেই বর্তমান থাকে। প্রতিটি DNA ১,০০০-এরও অধিক সংখ্যক জীনের জন্য সংকেত বহন

www.pathagar.com

করে। কোষে অর্থাৎ জীবের দেহে যে সব কাজ হবে তার সমস্ত সংকেতই DNA-এর মধ্যে নিহিত থাকে ঠিক কম্পিউটারের মধ্যে Data বা তথ্য দিয়ে দেয়ার মতই। এখানেই প্রশ্ন, কম্পিউটারের মধ্যে Data প্রদান করে না হয় তার পরিচালক বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলী কিন্তু DNA-এর মধ্যে সংকেতগুলো দিয়ে দেয় কে? যদিও সন্তান কোষের জীবনে যে সব কাজ হবে তা তার জন্মদাতা কোষের পক্ষে পূর্বাহ্নেই জানা সম্ভব নয় বলে তার DNA-এর পক্ষে সন্তান কোষের DNA-এর মধ্যে আগেভাগেই কোনও নির্দেশ বা সংকেত দিয়ে রাখা সম্ভব নয় তবুও সন্তান কোষের DNA-গুলোর ক্ষেত্রে, তর্কের খাতিরে যদিও বা এটা মনে করা যেতে পারে যে তারা সে সব সংকেত পায় তাদের জন্মদাতা কোষের DNA-এর কাছ থেকে কিন্তু সর্বপ্রথম জীবদেহের সর্বপ্রথম DNA-গুলো, যারা আসলে জড় পদার্থ মাত্র-তারা তাদের ভবিষ্যত জীবনের সম্পাদনীয় কাজগুলো সম্পর্কে আগেভাগেই জেনেছিলই বা কি করে আর সে সম্পর্কে নির্দেশ বা সংকেতগুলোই বা পেয়েছিল কার কাছ থেকে; আর জড় DNA-গুলো সে সব সংকেত অনুসারে কাজই বা করেছিল কীভাবে-যারা জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে না হয় কাজ করতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম DNA-গুলো তো আর প্রথমেই জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না, হয়েছিল পরে? আর, এর পরেই বা তারা জীবন পেল কোত্থেকে এবং কীভাবে? আর সর্বোপরি জীবনই বা কি? এইসব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত আছে 'স্রষ্টা আছে কি নেই'—এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর, যা অবশ্যই হাঁ-বোধক এবং কখনোই না-বোধক নয় এবং তা হতেও পারে না।

যাহোক, বংশগতির বাহন এই জীনগুলো পিতার দিক থেকে থাকে তার শুক্রকীটের প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ তার মাথায় যে ২৩টি ক্রোমোজোম থাকে তারই মধ্যে। অতএব, আমরা দেখি যে, এই যে জীনগুলো—যাদের মাধ্যমে বংশগতি বাহিত হয় তারা পুরুষের বীর্যের একটা 'বিশুদ্ধ সার অংশ'ই। এটা যে পুরুষের একবারে নিক্ষিপ্ত সবটুকু বীর্যের কত ক্ষুদ্রতম একটা অংশ তারও একটা মোটামুটি হিসাব আমরা বের করে দিতে পারি। একজন সুস্থ, সবল ও সক্ষম পুরুষ একবারে যে বীর্য নিঃক্ষেপ করে তার গড় পরিমাণ হচ্ছে ৩.৫ ঘন সেন্টিমিটার (Cubic Centimetre, সংক্ষেপে C. C.)। এই বীর্যের একটা বৃহত্তর অংশ হচ্ছে বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস-যে রসের মধ্যে, শাব্দিক অর্থেই, 'জিয়ানো' থাকে শুক্রকীটসমূহ। প্রতি এক সি. সি. বীর্যের মধ্যে এই শুক্রকীটসমূহের সংখ্যা হচ্ছে গড়ে ১২০ মিলিয়ন বা ১২ কোটি (Text Book of Medical Physiology-Guyton, ১৭শ সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ.-৯৫৮)-যাদের

www.pathagar.com

সম্মিলিত আয়তন হয়তো সমগ্র এক সি. সি. বীর্যের এক দশমাংশের বেশি নয় এবং যে এক সি. সি. বীর্যও আবার একবারের মোট বীর্যের ৩.৫ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সুতরাং অংক কষে দেখা যায় যে, ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য একটিমাত্র শুক্রকীটের যে মাথাটি দরকার (যার আয়তন সমগ্র শুক্রকীটটির অর্ধাংশের মত মাত্র) তার আয়তন সমগ্র ৩.৫ সি. সি. বীর্যের ৮৪০ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই মাথাটিরও আবার একটা অংশ হচ্ছে ২৩টি ক্রোমোজোম–যাদের মধ্যে থাকে অন্যূন ২০ লক্ষটি DNA। এদের প্রত্যেককে যদি একটি করে জীন হিসাবে গণ্য করা যায় তাহলে একটি জীন হচ্ছে সমগ্র ৩.৫ সি. সি. বীর্যের প্রায় ১৬৮ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র! DNA-গুলোর মোট আয়তন যদি মাথার এক দশমাংশ ধরা যায় তাহলে সবগুলো DNA-এর মোট আয়তন হচ্ছে এই সমগ্র ৩.৫ সি. সি. বীর্যের প্রায় ৮৪০০ কোটি ভাগের এক ভাগ; আর অত্যাবশ্যক ৩০,০০০ জীনের মধ্যে থেকে যে জীনগুলো বংশগতির বাহন হিসাবে কাজ করে তাদের সংখ্যা যদি এই অত্যাবশ্যক জীনসমূহের শতকরা ১০ ভাগ করে ধরা হয় তাহলে এই বংশগতির বাহক জীনের মোট সংখ্যা হয় ৩,০০০টি এবং তাদের সর্বমোট আয়তন হবে এই ৩.৫ সি. সি. বীর্যের ৫.৬ লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র! এখন যেহেতু একটিমাত্র শুক্রকীটের কেবলমাত্র মাথাটি এবং তন্মধ্যস্থ জীনই হচ্ছে বীর্যের একেবারে কার্যকর ও সক্রিয় অংশ তথা একেবারে নির্যাস বা সারভাগ সুতরাং পাঠক কি কল্পনা করতে পারেন যে, সন্তান জন্মদানের জন্য একটিমাত্র শুক্রকীটের শুধুমাত্র যে মাথাটি দরকার তা এবং বংশগতির বাহন যে জীন বা DNA তা পুরুষের একবারের নিক্ষিপ্ত ৩.৫ সি. সি. বীর্যের কত সামান্যতম বিশুদ্ধ সার ভাগ? সন্তান জন্মদান ও বংশগতির ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকার কথা পুরুষের ভূমিকার ন্যায় অত স্পষ্টাক্ষরে আল কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি এবং তাও সম্ভবত এই কারণে যে, আল্লাহ্ তায়ালা জানতেন যে, নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের মত "অবজ্ঞাত সলিল" তথা নিক্ষিপ্ত বীর্য বলে কিছু নাই এবং সে বিষয়ে তখনকার মানুষের মনে কোনও প্রশ্নও ছিল না।

উপরে এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করেছি তা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি যে, সন্তানের জন্ম ও তার বংশগতির বাহন সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য আর সে বিষয়ে আল কোরআনের বক্তব্য একেবারে অভিন্ন। শুধু পার্থক্য এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা এখনকার বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী ব্যবহার না করে তখনকার মানুষ যেভাবে বুঝত সেইভাবের কথার

www.pathagar.com

(বিশুদ্ধ সার অংশ) মাধ্যমেই আসল কথাটি সর্বকালের মানুষকেই জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ যা বলেছেন এখনকার পরিভাষায় তার অর্থ এই যে, বিভিন্ন গ্রন্থির রস ও শুক্রকীটসমূহের মিশ্রণ যে বীর্য তার সার নির্যাস বা কার্যকর উপাদান হচ্ছে একটি শুক্রকীট এবং তারও বিশুদ্ধ অংশ হচ্ছে জীন এবং আল্লাহ্ তায়ালা বীর্যের সেই সার অংশ অর্থাৎ শুক্রকীট ও জীনকেই ব্যবহার করেছেন মানুষের বংশধর সৃষ্টি ও তার বংশগতির বাহণ কার্যে। তখনকার মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান শুক্রকীট, জীন, এই সমস্ত শব্দ তো বুঝতই না, মানুষের বীর্যের মধ্যেও যে এত কোটি কোটি সজীব কীট আছে ও তাদের মধ্যে যে আবার একটিমাত্র কীটের শুধু মাথাটি ব্যবহৃত হয় সন্তানের জন্মের জন্য, আর তারও মধ্যস্থ জীন যে আবার বংশগতির বাহণ এসব কথা তো কল্পনায়ও আসতে পারতো না। বরং যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে এই সব কথা বলতেন সেই রাসুলুল্লাহ্ (দঃ) কেই তারা পাগল বলে উপহাস করত–এমনিতেই যা করতে তারা কম করে নি (১৫ ঃ ৬) এবং এখনো করছে এক শ্রেণীর মানুষ! অথচ আল কোরআনের বক্তব্য সেই কালের যখন প্রজনন বিদ্যা ও প্রজনন কৌশল বা বংশগতি বিজ্ঞান সম্পর্কে এত সুক্ষ্ম কথা মানুষের জানা ছিল না, যা আমরা জানতে পারছি এই চৌদ্দ শত বৎসর পরে সাম্প্রতিককালের এই অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনের পর। প্রশ্ন এখানেও যে, সেই কালের একজন অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের পক্ষে কি তার কালের চৌদ্দ শত বৎসর পরে এই আজকের বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হবে এমন কোনও কথা তার নিজের জ্ঞান থেকে অগ্রীমভাবে বলে দেয়া বা রচনা করা সম্ভব ছিল যদি আল কোরআন এক মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় সত্ত্বা আল্লাহ্ তায়ালার বিজ্ঞানময় কালাম ও তাঁর অবতারিত গ্রন্থ না হয়?

www.pathagar.com

চার

স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনের পর মাতৃগর্ভে সন্তানের জন্ম ও ক্রমিক দেহ গঠন ও পরিণতি কীভাবে হয় তারও এমন একটা নিখুঁত বর্ণনা আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছেন যা আজকের উন্নত ভ্রূণ বিজ্ঞানের সাথে হুবহু মিলে যায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন যে, তিনি প্রথমে পিতার শুক্রবিন্দুকে মায়ের জরায়ুর মত একটি অতি সুরক্ষিত স্থানে সংস্থাপিত করেন। তারপর সেই শুক্রের সার অংশ দ্বারা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তাকে একটি ঘনীভূত ও জরায়ু গাত্রে আটকানো রক্তপিণ্ডে রূপান্তরিত করেন। অতঃপর সেই ঘনীভূত রক্তপিণ্ডকে এক দলা মাংসে পরিণত করেন এবং তা থেকে অস্থির একটি দৃঢ় কাঠামো অর্থাৎ নরকংকাল গঠন করেন। অতঃপর সেই অস্থির কাঠামোকে মাংসমণ্ডিত করেন এবং এভাবেই তাকে একটি পূর্ণ মানবাকৃতি প্রদান করেন–তার চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করেন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই সময়ে গর্ভস্থ শিশুর বয়স ঠিক চার ঋতুকাল বা ১১২ দিন তথা মোটামুটিভাবে প্রায় চার মাস পূর্ণ হয় এবং ইসলাম বলে যে, ঠিক এই সময়েই আল্লাহ্ তায়ালা সেই শিশুর মধ্যে তাঁর রূহ্ থেকে ফুৎকার করেন–অর্থাৎ তাতে রূহ্ প্রবেশ করিয়ে দেন। এ থেকেও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, 'রূহ্' এমন একটি পৃথক সত্ত্বা যা মাতৃগর্ভে প্রায় চার মাস বয়স পর্যন্ত ভ্রূণের মধ্যে থাকে না, অথচ তখনও ভ্রূণের দেহে 'প্রাণ' থাকে। সুতরাং প্রাণ ও রূহ্ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বা। এ সম্বন্ধে ইমাম গাজ্জালী (রঃ)-ও তাঁর 'কিমিয়ায়ে সা'য়াদত' গ্রন্থের 'দর্শন খণ্ডের' পরকাল দর্শন অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। ঠিক এই সময় থেকেই গর্ভস্থ শিশুর নড়াচড়া শুরু হয়। শিশু অবশ্য তার আগেও জীবিত থাকে, কারণ অন্যান্য জীবের মতই সে সময়েও তারও জীবন থাকে। কিন্তু জরায়ু মধ্যে চার মাস বয়স না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা তার মধ্যে রূহ্ ফুৎকার করেন না বলে জীবিত থাকা সত্ত্বেও তার নড়াচড়া শুরু হয় না। রূহ্ অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার মাধ্যমে সে দৈহিক এবং রূহানী উভয় দিক দিয়ে পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তায়ালার মনোনীত অনেকানেক মহামানব মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেই বহির্জগতের অনেক কিছুই তাঁদের মাতাদের মাধ্যমে জানতে পারেন–কেউ কেউ তাঁদের মায়ের কাছ থেকে শুনে শুনে মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেই কোরআন শরীফ পর্যন্তও হেফ্জ করেছেন। গাউসুল আযম হজরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) মাতৃগর্ভে থাকা

www.pathagar.com

অবস্থাতেই তাঁর আঠার পারা কোরআনের হাফেজা মায়ের তেলাওয়াত শুনে শুনেই আঠার পারা কোরআন হেফ্‌জ্‌ করেছিলেন এবং তাঁর ওস্তাদের কাছে প্রথম সবক গ্রহণের সময়েই একবারে আঠার পারা কোরআন পড়ে শুনিয়েছিলেন। (আলহাজ্ব মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী-কৃত হজরত বড় পীর সাহেবের জীবনী, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪ দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি বৃটিশ শরীর তত্ত্ববিদ পিটার হেপারও প্রমাণ করেছেন যে, "মাতৃগর্ভেই শিশুও গান শোনে।"-তিনি দেখেছেন যে, গর্ভধারণের ১২ সপ্তাহের মধ্যেই শিশুরাও উপলব্ধি করে যে তাদের মায়েরা গান শুনছে। এই সঙ্গীত জন্মের পরেও শিশুদের মনে থাকে (দৈনিক উত্তর বার্তা, ২০/১২/১৯৯০ ইং; ১৯/১২/১৯৯০ইং তারিখে লন্ডন থেকে প্রেরিত)। যাহোক, এই প্রায় চার মাস পর ২৭০/২৮০ দিন পূর্ণ হতে যে সময় বাঁকি থাকে সেই সময়ের মধ্যে মাতৃগর্ভে শিশুর দৈহিক গঠন বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয় এবং যথাসময়ে সে পূর্ণ মানবশিশুরূপে জন্মলাভ করে। আল্লাহ্‌ আরও বলেন যে, তিনি এই ২৭০/২৮০ দিন ধরে গর্ভস্থ শিশুকে "তিনটি অন্ধকার পর্দার মধ্যে সৃষ্টির পর সৃষ্টিতে সৃষ্টি করেন।"–অর্থাৎ এক আকৃতি থেকে অন্য আকৃতিতে রূপান্তরিত করে করে পূর্ণ মানবরূপ প্রদান করেন এবং তারপর সময়মত সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয় মানব-শিশু হিসাবেই।

পাঠককে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল কোরআন যখন এই ভ্রুণ-বিকাশতত্ত্ব প্রকাশ করেন তখনকার সে সময়টা ছিল আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশো বছর আগের সময়-যখন চিকিৎসা শাস্ত্রই একটা সঠিক বিজ্ঞান হিসাবে গড়ে ওঠেনি এবং মানবদেহের গঠন সম্বন্ধেও মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ব্যবচ্ছেদ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানব দেহের গঠন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বা দেহ গঠন বিদ্যা (Anatomy) গড়ে উঠেছে তার পরে এবং ভ্রুণ বিজ্ঞান বা পুরুষ শুক্রকীট দ্বারা স্ত্রী ডিম্বাণুর নিষেকের ফলে উৎপন্ন জাইগোট থেকে কীভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুর উদ্ভব (আমি উদ্ভব শব্দই ব্যবহার করেছি, কারণ বিজ্ঞান স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার এবং সৃষ্টি শব্দটি ব্যবহার না করার দিকেই প্রবণ) হয় সে সম্বন্ধীয় ব্যবচ্ছেদ ও পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তারও আরও অনেক পরে। দেখা যাক আল কোরআনের এই ভ্রুণ গঠন তত্ত্ব আর আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য কতটুকু।

ভ্রুণ বিজ্ঞান অনুসারে শুক্রকীট কর্তৃক ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়া দ্বারা মাতৃগর্ভে যে জাইগোট উৎপন্ন হয় তা অতি দ্রুত বিভক্ত হতে থাকে এবং ক্রমশঃ বহুকোষ

www.pathagar.com

বিশিষ্ট একটি পিণ্ড বা বলের মতো হয়, আল কোরআন যাকে রক্তপিণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন। এই কোষ পিণ্ডের কোষসমূহ যদি এইভাবে বিভাজনের মাধ্যমে শুধু সংখ্যায়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকত এবং আর কোন পরিবর্তন না হতো তাহলে ২৭০/২৮০ দিন পর ফুটবল বা তার চাইতে বড় আকৃতির একগাদা নরম কোষপিণ্ড হিসাবেই তা মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট হতো। কিন্তু তা হয় না। প্রথমে উৎপন্ন কোষপিণ্ডের কোষগুলো বিভক্ত হয়ে আরও যতই সংখ্যায় বাড়তে থাকে ততই তাদের মধ্যে শ্রম বিভাগ বা Differenciation হতে থাকে। বিশেষ বিশেষ কোষগুচ্ছ বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত হয়–একটা সুগঠিত মানব সমাজের সদস্যদের মধ্যেকার শ্রম বিভাগ বা Division of Labour-এর মতই। এইসব কোষগুচ্ছকে বলা হয় কলা বা Tissue। ইতিমধ্যে ভ্রুণটি-এখন একে ভ্রুণই বলা হয়–গর্ভফুলের মাধ্যমে জরায়ুর ভেতরগাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এইসব কলার কিছু সংখ্যক হয় অস্থিকলা–যা দেহের শক্ত কাঠামো গঠন করে, কিছু সংখ্যক হয় মাংসপেশি কলা-যা অস্থিসমূহকে মণ্ডিত করে; আরও কিছু কিছু সংখ্যক কোষ আরও আরও সব কলা গঠন করে। এইসব কলার সমন্বয়ে বিভিন্ন অঙ্গ ও তাদের সমন্বয়ে আবার অঙ্গতন্ত্রসমূহ গঠিত হয় এবং ভ্রুণটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুতে পরিণত করে। ভ্রুণ বিজ্ঞান বলে যে ভ্রুণের প্রায় চার মাস বয়সেই তার পেশীতন্ত্রের গঠন সম্পূর্ণ হয় এবং অস্থির কাঠামোটির মাংসপেশী মণ্ডিত হওয়া সম্পূর্ণ হয় এবং এই সময়েই গর্ভস্থ শিশু নড়াচড়া করতে শুরু করে সুগঠিত মাংসপেশীতন্ত্রের সাহায্যে; কারণ দেহের যাবতীয় নড়াচড়া সংঘটিত হয় একমাত্র মাংসপেশীর সংকোচন-প্রসারণের সাহায্যেই। ইসলামও ঠিক এই বয়সেই গর্ভস্থ শিশুর মধ্যে আল্লাহ্ কর্তৃক রূহ্ ফুৎকার করার কথা বলে–যার জন্যে এই সময় থেকেই শিশু নড়াচড়া করতে শুরু করে।

ভ্রুণ বিজ্ঞান বলে যে, জরায়ুর মধ্যে গর্ভস্থ ভ্রুণ ও শিশু তিনটি পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। বাইরে থেকে ভেতর দিকে এ তিনটি পর্দা হচ্ছে (১) Decidua-যা জরায়ু গহ্বরের ভেতরগাত্রের পদার্থের (Endometrium) রূপান্তরের মাধ্যমে উৎপন্ন একটি পর্দা, (২) Chorion নামক পর্দা এবং (৩) Amnion-যার মধ্যে থাকে Amniotic Fluid বা Liquor Amnioni, সাধারণ কথায় যাকে বলা হয় "পানি"; এই পানির মধ্যেই ভ্রুণ বা শিশুটি থাকে এবং বড় হয় এবং যে পানীয় মাধ্যমের অভাবে সে বাঁচতে পারে না। জাইগোটরূপে উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে আকার আকৃতির দিক দিয়ে মানুষের ভ্রুণ দেখতে মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ ও পাখির ভ্রুণের মতই থাকে। প্রথম ছয় সপ্তাহ যাবৎ মানুষের

www.pathagar.com

ভ্রূণ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণের মধ্যে কোনও পার্থক্যই করা যায় না–একমাত্র বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি ছাড়া। দ্বিতীয় মাসের পর থেকে মানুষের ভ্রূণ সুস্পষ্টভাবে মানবীয় আকার নিতে শুরু করে এবং তখন থেকে মানুষের ভ্রূণ বলে চেনা যায়। গাঠনিক এই পার্থক্যের জন্যই প্রথম দু-মাস একে ভ্রূণ বা Embryo এবং তারপর থেকে 'গর্ভস্থ শিশু' বা Foetus নামে অভিহিত করা হয়। ২৮তম সপ্তাহে শিশু বাঁচার উপযুক্ত হয় এবং প্রসূত হলে "আটাশে শিশু" হিসাবে বাঁচতেও পারে; তবে এরূপ সন্তানের বেঁচে থাকার হার খুব কম। যাহোক, ভ্রূণ বিজ্ঞান বলে যে, জরায়ুর মধ্যে তিনটি পর্দা দ্বারা আবৃত হয়ে মানব ভ্রূণ কখনো মাছ, কখনো ব্যাঙ, কখনো সরীসৃপ, কখনো পাখি এবং কখনো বা অন্য কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণের আকার গ্রহণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মাসের পর থেকে তা সুস্পষ্ট মানবীয় আকার নিতে শুরু করে এবং চতুর্থ মাসের শেষে অস্থিসমূহের মাংসপেশীমণ্ডিত হওয়া সমাপ্ত হওয়া দ্বারা তার মানবাকৃতি গ্রহণ সম্পূর্ণ হয় এবং তখন সে নড়াচড়াও করতে শুরু করে। গর্ভকালের অবশিষ্ট দিনগুলোতে তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। ঠিক এই কথাই আল্লাহ্ তায়ালা কি সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করেছেন যখন তিনি বলেন, "তিনি তোমাদিগকে তোমাদের জননীদের গর্ভে তিনটি অন্ধকার পর্দার মধ্যে সৃষ্টির পর সৃষ্টিতে সৃষ্টি করেছেন" (৩৯ঃ ৬) এবং "অনন্তর তাকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন এবং তন্মধ্যে স্বীয় রূহ্ থেকে ফুৎকার করেছেন এবং তোমাদের চক্ষুসকল, কর্ণসকল ও অন্তঃকরণসমূহ করেছেন।" (৩২ ঃ ৯) এবং সর্বশেষে "আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত করেছেন।" (১৬ ঃ ৭৮)

উদ্ধৃত ৩৯ ঃ ৬ নং আয়াতের পর্দা তিনটি সম্পর্কে 'অন্ধকার' কথাটি লক্ষ্যণীয়। মাতৃগর্ভে অর্থাৎ জরায়ু নামক যে থলিটির মধ্যে উক্ত পর্দা তিনটি অবস্থিত এবং যার মধ্যে উক্ত পর্দাসমূহ দ্বারা আবৃত অবস্থায় মানবশিশু বড় হয় তাও যদিও অন্ধকারই কিন্তু তবুও আয়াতে তাকে অন্ধকার বলে উল্লেখ না করে তার ভেতরের পর্দা তিনটিকে 'অন্ধকার' বলে উল্লেখ করার কারণ কি? শুধু আলোর অবিদ্যমানতাই সম্ভবত এর সঠিক কারণ নয়, বরং কারণ অন্যতর। কারণ, এখানে অন্ধকার শব্দটির সঠিক অর্থ যদি নিছক আলোর অভাবই হতো তাহলে জরায়ুকেও তো অন্ধকার বলা যেতে পারত। কিন্তু তা না করে কেবলমাত্র তার ভিতরের পর্দা তিনটিকে অন্ধকার বলার তাৎপর্য কি? আধুনিক ভ্রূণ-বিজ্ঞান থেকে আমরা এর তাৎপর্য অনুধাবণ করতে পারি।

www.pathagar.com

ভ্রূণ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি যে Decidua-কেও একটা পর্দা হিসাবে গ্রহণ করলে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ বা মানবশিশু যে Decidua, Chorion এবং Amnion নামক তিনটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে বলে মনে করা যায় তাদের মধ্যে শেষোক্ত দু-টো পৃথক পর্দা দ্বারা গঠিত দু-টো Blind Sac বা অন্ধ থলি হিসাবেই ভ্রূণ বা শিশুকে আবৃত করে রাখে। Blind Sac বা অন্ধ থলি তাকেই বলা হয় যার কোনও মুখ-অর্থাৎ প্রবেশ এবং বহির্গমন পথ নেই। পর্দা দ্বারা গঠিত এই দুইটি থলিরও কোন মুখ নেই, এরা দু-টোই অন্ধ থলিই। অবশ্য জরায়ু নিজে কিন্তু এরূপ কোন অন্ধ থলি নয়; কারণ জরায়ুর মুখ-অর্থাৎ প্রবেশ এবং বহির্গমণ পথ আছে। যে Decidua-কে আমরা প্রথম আবরণ বলে গ্রহণ করেছি তা যদিও আসলে জরায়ুর ভেতরগাত্রের শ্লেষ্মিক ঝিল্লিরই রূপান্তরিত রূপমাত্র এবং সুতরাং যদিও তার মুখও খোলাই, কিন্তু তথাপি গর্ভকালে জরায়ুগ্রীবার এই খোলা মুখ একটি তথাকথিত 'শ্লেষ্মা-ছিপি (Mucus Plug)' দ্বারা বন্ধ থাকার কারণে এটাকেও একটা অন্ধ থলি হিসাবেই গ্রহণ করা যায়। অবশ্য যদিও এই Decidua আসলে জরায়ুর ভেতরগাত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লী গঠিত বলে জরায়ুরই অংশস্বরূপ এবং প্রসবের সময়ে অন্য দুটো পর্দার সঙ্গে এটা বের হয়ে যায় না এবং সেই কারণে সত্যিকার অর্থে এটা কোন পর্দা নয় তবুও যেহেতু প্রসবের তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এটা বিনষ্ট হয়ে গলিত আকারে প্রসব পথ দিয়েই বের হয়ে যায় জরায়ুকে যথাস্থানে রেখেই সুতরাং একেও আমরা একটা পৃথক পর্দা হিসাবেই গণ্য করতে পারি। সন্তান যখন প্রসব হবে তখন স্বাভাবিক অবস্থায় জরায়ুগ্রীবার 'Mucus Plug' টা 'Show' হিসাবে আগে বের হয়ে আসে এবং তারপর Amniotic Fluid-এর একটা অংশ 'পানি' বা Fore-water হিসাবে ভেতরের থলি দুইটিরই একটা বর্ধিত অংশবিশেষকে জরায়ুগ্রীবার মধ্য দিয়ে ঠেলে প্রসবপথের মধ্যে বের হয়ে আসে এবং পর্দা দু-টোকে ছিঁড়ে এই পানি প্রসব পথকে পিচ্ছিল ও জীবাণুমুক্ত করে এবং অতঃপর এই ছিন্নতার মধ্য দিয়েই সন্তান ভূমিষ্ট হয়। কখনো কখনো এমন হয় যে, ভূমিষ্ট হওয়ার সময় সন্তান কিংবা গর্ভপাতের সময় ভ্রূণ বা অপরিণত সন্তানও ভিতরের দুইটি থলিই কিংবা শুধু ভেতরের থলিটি দ্বারা আবৃত অবস্থাতেই ভূমিষ্ট বা বহির্গত হয়ে আসতে পারে। যাহোক, আসল কথা হচ্ছে এই যে, ভেতরের পর্দা দুটো দ্বারা গঠিত দুটো থলি এবং Mucus Plug যুক্ত Decidua দ্বারা গঠিত থলিটি সহ তিনটে থলিই মুখবিহীন বা অন্ধ; কিন্তু জরায়ু তা নয়। উক্ত আয়াত শরীফে জরায়ুও অন্ধকার হওয়া সত্ত্বেও তার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না করে কেবলমাত্র পর্দা তিনটিকে অন্ধকার বলার তাৎপর্য এখানেই (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)। বাস্তবিক পক্ষে জরায়ু Blind বা আন্ধা তথা অন্ধকার নয় কিন্তু পর্দা তিনটে অন্ধকার তথা Blind বা আন্ধাই।

www.pathagar.com

অতএব আমরা দেখি যে, জরায়ু মধ্যে সন্তানকে আবৃতকারী পর্দা সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্য আর চৌদ্দশত বছর আগের আল কোরআনের বক্তব্য অভিন্ন।

উপরে যা বলা হলো তা থেকে এটা আমরা সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি যে, আধুনিক ব্যবচ্ছেদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক ভ্রূণ-বিজ্ঞান আজ যে কথা বলছে, আজ থেকে চৌদ্দশো বছর আগেই আল কোরআন মানব শিশুর জন্ম সম্পর্কে মানুষকে ঠিক সেই কথাই জানিয়ে দিয়েছেন। তখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞানও এ কথা জানত না, আর নিরক্ষর নবী মোহাম্মদ (দঃ)-ও সে সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা জানতেন না। কাজেই তাঁর পক্ষে সেই সময়ে অগ্রীমভাবে চৌদ্দশো বছর পরের বিজ্ঞানের কথা জানা এবং তা প্রকাশ করা যে কী করে সম্ভব হলো যদি আল কোরআন মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্ তায়ালার কালাম না হয়–এ এক বিরাট প্রশ্ন।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ ও মানবশিশুর বেঁচে থাকার ও বিকাশের জন্য Liquor Amnioni-এর অপরিহার্যতা এবং বিভিন্ন সময়ে ভ্রূণের মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখী এবং অন্য কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণের আকার গ্রহণকেই জৈবিক প্রকৃতির বিবর্তনবাদীরা তাদের বিবর্তনবাদের স্বপক্ষের একটি বড় প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করে থাকেন। তাঁরা এটাকে Recapitulation বা পুনরাবৃত্তি হিসাবে আখ্যায়িত করে এটাই বলতে চান যে মানব ভ্রূণ যেন জলীয় মাধ্যম (Aquous Medium)-এ এককোষী জীব হিসাবে তার প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে মানুষে পরিণত হওয়া পর্যন্ত তার বিবর্তনের কোটি কোটি বছরের সমগ্র ইতিহাসকে মাতৃগর্ভে এইরূপ ক্রম-রূপান্তরের মাধ্যমে পুনরায় "স্মরণ" করে। কিন্তু যে প্রকৃতি সব সময়ে 'সহজতম ও সংক্ষিপ্ততম পন্থায় কাজ করে' সেই প্রকৃতিই আবার কেন যে ওই স্বল্প সময়ে সেই দীর্ঘ পথ পুনরায় পরিক্রমণ করে এবং যে মানুষ তার কোটি কোটি বছরের কথিত বিবর্তনকে পিছনে ফেলে এসেছে তারই ভ্রূণ কেন যে মাত্র দুই মাসের মধ্যে (স্মর্তব্য যে দুই মাসের মধ্যেই ভ্রূণের মানবাকৃতি গ্রহণ সম্পূর্ন হয়) সেই কোটি কোটি বছরের ইতিহাসকে পুনরায় স্মরণ করে এ কথার কোনও ব্যাখ্যা বিবর্তনবাদে নেই। তাছাড়া জাইগোটটি কী করে জানল যে, তার এরূপ একটি কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ইতিহাস আছে? মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও তো জাইগোটটির বরং

www.pathagar.com

"মানবেতর" জীবনের তার সেই পূর্ব ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির অতলে পাঠিয়ে দিয়ে সে "লজ্জার" কথা একেবারেই মনে না করারই কথা–যদি সত্যই সে ইতিহাস তার আদৌ জানাই থেকে থাকে। তাছাড়া, এই Recapitulation-এর সময় ভ্রূণের জীবকোষের ক্রোমোজোমের তো Recapitulation হয় না? ভ্রূণটি তার বিকাশের পথে যে যে প্রাণীর আকৃতিতে যখন যখন থাকে, সেই সেই সময়ে তার জীবকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যাও তো তাই তাই-ই থাকা উচিৎ? অর্থাৎ যখন সে মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতির আকারে থাকে তখন তার ক্রোমোজোমের সংখ্যাও মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতির ক্রোমোজোমের সমসংখ্যকই থাকা উচিৎ, কিন্তু তা থাকে না। আসলে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদসহ এ সবই মানুষকে একটি সাধারণ পশুর স্তরে নিয়ে যাওয়ার এবং তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের হানাহানীকে একটি স্বাভাবিক জৈবিক কাজ বলে প্রতিপন্ন করার এবং তদ্বারা "যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন" নীতির অনুশীলনের মাধ্যমে অযোগ্যতর মানুষদেরকে ধ্বংস করে যোগ্যতমদের উদ্‌বর্তন অর্জনকে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন (Justify) করার জন্য তথাকথিত উন্নততর মানুষদের উদ্ভাবিত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার মাত্র। আসলে, আল্লাহ্ রাবক্ষুল আ'লামিনের সৃষ্টিতে তাঁর খলিফাদের মধ্যে এরূপ কোনও হানাহানী নেই। বাস্তবে আমরা যা দেখতে পাই তা বিবর্তনবাদের অনুসারী যোগ্যতমের উর্ধ্বর্তন অর্জনকামীদের মধ্যে, 'রব'-এর খলিফাদের মধ্যে নয়। সুতরাং Recapitulation-এর ওই কল্পনা ভ্রান্ত। মাতৃগর্ভে মানবভ্রূণের ক্রমরূপান্তর হয় ঠিকই কিন্তু তা হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই এবং আল্লাহ্ যখন তাকে ক্রমশ 'মানবাকৃতি'তে নিয়ে যান তখন দুই মাস কালের বিভিন্ন সময়ে তাকে ওরূপ বিভিন্ন 'আকৃতি'ই প্রদান করেন; আসলে সে তখন বাস্তবে ওই ওই সব জীব থাকে না, এবং তা যে সত্যিই থাকে না তা ওই ওই সময়ে তার দেহের কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা থেকেও স্পষ্ট। আর যেহেতু প্রক্রিয়াটি আকস্মিক নয় ধারাবাহিক সুতরাং ওরূপ ক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমেই তাকে পূর্ণ 'মানবাকৃতি'তে নিয়ে যেতে হয় এবং আল্লাহ্ তাই-ই করেন। (আল্লাহ্ ভাল জানেন)

www.pathagar.com

পাঁচ

পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব ও তার বিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞানের তিনটি মতবাদের কথা বলেছি। সেই সঙ্গে আল কোরআন যে মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবের সৃষ্টি পৃথকভাবে হয়েছিল বলে বলেন এবং তাদের সৃষ্টির যে বর্ণনা প্রদান করেন সে সম্বন্ধেও বিস্তারিত বলেছি। এবার বিজ্ঞানের তিনটি মতবাদ সম্পর্কে আরও একটু বিশদভাবে ভেবে দেখা যাক।

বিজ্ঞানের তিনটি মতবাদকে পৃথকভাবে এবং পৃথক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করা হলেও আসলে তাদের মৌলিক ধারণা ও প্রবণতা একই। তারা সকলেই সৃষ্টিতে বিশ্বাসী নয়, উদ্ভবে বিশ্বাসী। তারা সকলেই বলে যে, জীবের আবির্ভাব আকস্মিকভাবেই এবং আপনা আপনিই হয়েছিল। আর দুইটি মতবাদ, প্রজাতিগুলোকে আমরা এখন পৃথিবীতে যেভাবে দেখছি সেইভাবেই এবং আপনা থেকেই "হঠাৎ একদিন"-তা একযোগেই হোক বা ক্রমান্বয়েই হোক-আবির্ভূত হয়েছিল বলে মনে করে; আর বিবর্তনবাদও সেই "হঠাৎ একদিন"-ই আপনা আপনিই উদ্ভূত হয়েছিল বলে মনে করে, তবে সে উদ্ভব প্রজাতির নয়, একটি আদিম জীবনাণু প্রোটোপ্লাজম্-এর, যা থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে দৃষ্ট প্রজাতিসমূহের (মানুষসহ) উদ্ভব হয়েছে বলে বিশ্বাস করে। অন্য দুইটি মতবাদ পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত প্রজাতিসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে বলে বিশ্বাস করে, আর বিবর্তনবাদ প্রজাতিসমূহের বিবর্তন পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত চলবে-যেমন মানুষ থেকে অতি মানুষে (Superman), গরু থেকে হয়তঃ অতিগরু ইত্যাদি–বলে বিশ্বাস করে। দেখা যাক, এদের এসব ধারণা বা বিশ্বাস কতখানি যুক্তিসিদ্ধ। প্রথমে পরিবেশের অনুকূলতার কথাই ধরা যাক।

এরা বলে যে, পরিবেশ অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব হয়নি। তারা বলে যে, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে জীবের উদ্ভব পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন আপনা আপনিই হয়েছিল এবং তা জীবের তথাকথিত উদ্ভবের দিকেই হয়েছিল। আকস্মিক মহাপ্রলয় মতবাদ ও বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব উভয়ই বলে যে, পৃথিবীর পরিবেশ যখন জীবের উদ্ভব ও জীবন যাপনের অনুকূল হলো, তখন জীবসমূহ আপনা আপনিই উদ্ভূত হলো। কিন্তু বাস্তবে এরূপ হওয়া

www.pathagar.com

সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। যে কোনও জীবেরই আগে একটি জড়দেহ থাকে এবং তার জীবন বা প্রাণও থাকে। প্রাণকে যদি আমরা (এ তত্ত্বদ্বয়ের প্রবক্তারা যেরূপ বলেন) অপ্রাথমিক সত্ত্বা বলেই মনে করি এবং জড়দেহকেই যদি প্রাথমিক সত্ত্বা বলে গ্রহণ করি তাহলে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর বুকে 'ছড়িয়ে ছিটিয়ে' থাকা জড় উপাদানসমূহ কীভাবে নিজেদের থেকে বিশেষ বিশেষ জীবদেহ গঠনের জন্য বিশেষ বিশেষ আকার আকৃতিতে "হঠাৎ করে" একত্রে গ্রথিত হলো? জড় উপাদানসমূহ নিজেরা উদ্দেশ্য বিবর্জিত; তারা কী করে জানল যে ওই নির্দিষ্ট নিয়মে গ্রথিত হলেই তারা বিশেষ বিশেষ জীবদেহে পরিণত হবে? আমাদেরকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, প্রজাতিসমূহ হয় একদিনে হঠাৎ করে উদ্ভূত হয়েছিল নতুবা তাদেরকে ক্রমে ক্রমেই উদ্ভূত হতে হয়েছিল। যদি একদিনে তারা হঠাৎ করে উদ্ভূত হয়েছিল বলে ধরা হয় তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে জড় উপাদানসমূহ নিজেরা হঠাৎ করে বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটে এসে নির্দিষ্ট নিয়মে পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে একদিনে একটা মানবদেহ বা ওই ধরণের অন্য কোনও একটা জীবের দেহ গঠন করল। আর যদি তারা ক্রমে ক্রমেই উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে এটাই বা কী করে সম্ভব যে জড় উপাদানেরা নিজেরা সেই বিভিন্ন স্থান থেকেই ছুটে ছুটে এসে একটা মানবদেহের বা ওই ধরণের অন্য কোনও জীবদেহের আজ খানিকটা, কাল খানিকটা করে এইভাবে ক্রমশ সম্পূর্ণ দেহটি গঠন করল? একটা জীবদেহ যদি একটা মাটির পুতুল বা একটা লোহার বলের মত নিরেট কিছু হতো তবুও না হয় উপাদানগুলো পরস্পরের সঙ্গে নিরেটভাবে গ্রথিত হয়ে একটা মানবদেহ বা অন্য কোন জীবদেহ গঠন করতে পারে বলে মনে করা যেত কিন্তু একটা জীবদেহ তো তা নয়; তার অভ্যন্তরটা ফাঁপা এবং তাতে অন্যান্য অঙ্গসমূহ আছে। আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক গঠন-বৈচিত্র্যবিশিষ্ট একটা জীবদেহ কি জড় উপাদানসমূহ নিজেরাই ওভাবে গঠন করতে পারে? এবং তা কি সম্ভব বলে মনে হয় কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষের কাছে? তারপর, হঠাৎ করে কিংবা ক্রমান্বয়ে গঠিত সেই জড়দেহ প্রাণই বা পেল কোথা থেকে? জড়দেহের উৎপত্তির পর দেহটি কি রোদ-বৃষ্টি কিংবা পানির মধ্যে ওভাবেই পড়ে থাকল প্রাণের উন্মেষের অপেক্ষায় এবং তাতে পরে প্রাণের উন্মেষ হলো, নাকি দেহের উদ্ভব সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে প্রাণের স্ফূরণ হলো? যদি বলা হয় যে, প্রাণের উন্মেষ পরে হয়েছিল তবে প্রশ্ন হয় যে, প্রাণহীন জড়দেহ কী করে নষ্ট না হয়ে বা পঁচে-গলে না গিয়ে প্রাণের উন্মেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকল? আর যদি বলা হয় যে, প্রাণ জড়দেহ থেকে উপজাত একটি সত্ত্বা যা জড়দেহ একটা নির্দিষ্ট (Optimum) রূপ বা আকার বা

www.pathagar.com

একটা গাঠনিক স্তরে পৌছামাত্র জড়দেহ থেকে আপনা আপনিই স্ফূরিত হয় তাহলেও প্রশ্ন হয় যে, দেহ গঠনকারী জড় উপাদানেরা নিজেরা কি সেই নির্দিষ্ট (Optimum) গাঠনিক স্তর সৃষ্টি করতে পারে যে স্তরে পৌছুলে জড়দেহে আপনা আপনিই প্রাণের উন্মেষ হয়? আর, সেই প্রাণই বা কি বস্তু? দেহ সেই নির্দিষ্ট আকার পাওয়ার পর এবং তাতে প্রাণের উন্মেষ হওয়ার পরই দেহের আর অধিক বৃদ্ধি হলো না কেন এবং সে বৃদ্ধি থেমে গেল কেন? প্রত্যেক প্রজাতির জন্য দৈহিক আকার সীমিত হয় কেন? একটা জীবদেহ গঠন তো দূরের কথা, আমরা তো এমন কখনো দেখিনা যে দলা দলা কাঁদা মাটি আপনা আপনিই উঠে এসে পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে একটা মাটির পুতুলে পরিণত হয়, তাতে প্রাণের উন্মেষের কথা বাদই দিলাম! বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, নির্মাতা ব্যতীত সামান্য একটি মাটির পুতুলের পর্যন্ত অস্তিত্বও সম্ভব নয় তখন জীবের মত একটা জটিল সত্ত্বা এবং জীবজগতের মত একটি জটিল জগতের উদ্ভব স্রষ্টা ও নির্মাতা ব্যতীত সম্ভব হতে পারে না। অতএব, স্রষ্টা ব্যতীত সমগ্র জীবজগত আপনা আপনি উদ্ভূত হয়েছিল, বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব বা আকস্মিক মহাপ্রলয় মতবাদের এ মত সত্যি নয়। এসব কিছুর পশ্চাতে এমন একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন যিনি অলক্ষ্যে থেকে তাঁর ইচ্ছেমত সব কিছুই সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর ইচ্ছেমতোই ধ্বংস ও পূনঃসৃষ্টিও করছেন। একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব যেরূপ বলে তদ্রুপ তিনি একবারও সৃষ্টি করে থাকতে পারেন আবার মহাপ্রলয় মতবাদ যেরূপ বলে তদ্রুপ তিনি বারে বারেও সৃষ্টি করতে পারেন; তখন সবই সম্ভব। অন্যথায়, অর্থাৎ স্রষ্টা ব্যতীত তা আপনা আপনিই সম্ভব নয়। আর, তিনি যে অলক্ষ্যে থেকেও তা সব করতে পারেন সেকথা আজকের দিনের এই মহাশূন্য অভিযানের যুগে যখন আমরা পৃথিবীতে বসেই কোটি কোটি মাইল দূরের মহাশূন্যযানকে তাদের যাত্রীদেরকেসহ নিয়ন্ত্রণ করতে এমন কি তাদেরকে মেরামত পর্যন্তও করতে পারছি, আর অবোধগম্য কিছু নয়।

বিবর্তনবাদ বলে যে, পৃথিবীর পরিবেশ যখন জীবের উদ্ভব ও জীবন ধারনের জন্য অনুকূল হলো তখন "হঠাৎ একদিন" পানির মধ্যে আপনা আপনিই প্রথম জীব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর উদ্ভব হয়। তারপর তা থেকেই প্রথমে ক্লোরোফিলবিশিষ্ট এককোষী উদ্ভিদের বিবর্তন হয়। এই এককোষী উদ্ভিদেরই এক শাখা থেকে ক্রমশ বহুকোষী উদ্ভিদ জগত উদ্ভূত হয় এবং অপর শাখা মিউটেশানের মাধ্যমে ক্লোরোফিল বর্জন করে এককোষী প্রাণীতে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

পরে এ থেকেই বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ পর্যন্ত সমগ্র প্রাণী জগতের উদ্ভব হয়। আর, এ সমগ্র প্রক্রিয়াই আপনা আপনিই সংঘটিত হয় একটা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার মতই। ব্যাপারটা আরও একটু ভেবে দেখা যেতে পারে। এতে বলা হয় যে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত প্রোটোপ্লাজম্-এর উদ্ভব হয়নি। তাহলে পরিবেশের কথাই আগে ভাবা যাক। পৃথিবীসহ সমগ্র জড়জগত কীভাবে অস্তিত্বে এসেছিল সে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি বিধায় এখানে আর সে কথা বলছি না। পৃথিবীর প্রাথমিক উত্তপ্ত অবস্থা থেকে পরবর্তী স্তরসমূহ সম্বন্ধে ভেবে দেখা যাক। উত্তপ্ত পৃথিবী আদৌ শীতল হলো কেন? বলা হতে পারে যে তাপ বিকীরণ করে শীতল হওয়া প্রত্যেক উত্তপ্ত বস্তুরই ধর্ম। কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন হতে পারে যে, তাপ বিকীরণ করে শীতল না হওয়াটাই বা উত্তপ্ত বস্তুর ধর্ম হলো না কেন? আমরা যাকে উত্তপ্ত বস্তুর ধর্ম বলে বলছি সেটা আসলে আমাদের ভূয়োদর্শনলব্ধ একটা জ্ঞান; আমরা প্রকৃতিতে এটাই দেখে আসছি। কিন্তু আমরা যদি আদি থেকেই তাপ বিকীরণ না করাটাই দেখে আসতাম তাহলে তো আমরা এটাই বলতাম যে তাপ বিকীরণ না করে শীতল না হওয়াটাই উত্তপ্ত বস্তুর ধর্ম? তবে ওরূপ হলো না কেন? ওই ধর্মটি কি উত্তপ্ত বস্তুর নিজস্ব অর্জন বা স্বয়ং সৃষ্ট, নাকি ওই ধর্মটি অন্য কেউ তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে ভবিষ্যতের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য? তারা বলে যে, প্রকৃতিতে যে সমস্ত মৌলিক উপাদান আছে তারই অন্যূন ছত্রিশটি উপাদান যোগে প্রথমে আপনা আপনিই প্রোটোপ্লাজম্-এর ভৌত দেহ গঠিত হয়। এই ছত্রিশটি উপাদান শর্করা, চর্বি, আমিষ, বিভিন্ন প্রকারের লবণ, ভিটামিন ও পানি এই ছয় প্রকার জৈব ও অজৈব যৌগ হিসাবে এতে বর্তমান আছে। এছাড়া, এনজাইম, হরমোন এবং DNA নামক জটিল জৈব যৌগও এতে আছে। এখন প্রশ্ন হলো প্রকৃতির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৌলসমূহের পক্ষে কি আপনা আপনিই নির্দিষ্ট নিয়মে সংশ্লিষ্ট হয়ে এই সব জটিল যৌগ গঠন করা সম্ভব? পুনরায় সেই সব জটিল যৌগের পক্ষেই কি আবার আপনা আপনিই অপর একটি নির্দিষ্ট নিয়মে পরস্পরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রোটোপ্লাজম্-এর ভৌত দেহ গঠন করা সম্ভব? বিজ্ঞানীরা DNA কে জীবনের ধারক উপাদান বলে চিহ্নিত করেন। সামান্য একটা দালানের সিঁড়ি নির্মাণ করতে যেখানে প্রচুর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ও কারিগরী দক্ষতাবিশিষ্ট বুদ্ধি ও চৈতন্যসম্পন্ন একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও অগণিত কর্মীর প্রয়োজন হয় সেখানে DNA অণুর চমৎকার নির্মাণ-শৈলীবিশিষ্ট বিসর্পিল সিঁড়ির মত একটি অপূর্ব অণু কি উহার গঠনকারী জড় উপাদানসমূহ নিজেরাই নির্মাণ করতে পারে বলে সেই আমরাই বিশ্বাস ও স্বীকার করতে পারি যে আমরা

www.pathagar.com

বিশ্বাস করি না যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ও কারিগরী দক্ষতাসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মী ব্যতীত শুধু উহার উপাদানেরা নিজেরা সামান্য একটা দালানের সিঁড়িও প্রস্তুত করতে পারে? ভৌতিক পরিবেশের পরিবর্তন এবং DNA সহ জীবনের ভৌতিক বুনিয়াদ প্রোটোপ্লাজম্-এর উদ্ভব পর্যন্ত জড় উপাদানসমূহের সংশ্লেষণ সেই বিশেষ দিকেই বা হলো কেন যাতে পরিণামে তা জীবনের উদ্ভব ঘটায়? এসব ঘটনা জীবনের উদ্ভব না হওয়ার দিকেই বা ঘটল না কেন? জীবনের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত সবকিছুই তো জড় পদার্থমাত্রই ছিল, যে জড়ের কোনও লক্ষ্যও নেই উদ্দেশ্যও নেই এবং সে ভবিষ্যত সম্বন্ধেও অজ্ঞ। তাছাড়া জড়ের নিজস্ব কর্মপ্রবর্তনাও নেই। তাহলে সেই জড় পরিবেশ ও জড় পদার্থসমূহ কী করে জানল যে, ওই বিশেষ নিয়মে ও ওই বিশেষ ধারায় পরিবর্তিত এবং ওই বিশেষ ধারায় সংশ্লিষ্ট হলেই তা থেকে ভবিষ্যতে এবং পরিণামে জীবনের বিকাশ ও জীবের উদ্ভব হবে? জীবন কি তাই বা সে জানল কী করে? আর, সে ওই জীবনের উদ্ভবই বা করতে গেল কেন? তার আগের কোটি কোটি বছরই তো পৃথিবী জীবন বিহীন অবস্থাতেই ছিল, পরিবেশও না হয় অপরিবর্তিতই থাকত? বিশ্বজাহানই বা আদৌ সৃষ্টি নাই-ই হতো? তাতে কি কারও কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হতো? যে কোনও ধরনের সঠিকতাই (Criticality) যেখানে বুদ্ধি ও চৈতন্য থেকে জাত সেখানে বুদ্ধি ও চৈতন্য বিহীন জড় পরিবেশ ও জড় উপাদানরাজি নিজেরা কী করে সেই সঠিকতায় উপনীত হলো যে সঠিকতায় উপনীত হলে জড় উপাদানের সংশ্লেষণের দ্বারা উদ্ভূত প্রোটোপ্লাজম্-এর ভৌতিক গঠনের মধ্যে জীবন বা প্রাণের স্ফুরণ হতে পারে? তারপর সেই সর্বপ্রথম জীব প্রোটোপ্লাজম্ জীবন ও মৃত্যুকে চিনল কি করে? সে জীবনকে না হয় বাস্তবে দেখল কিন্তু মৃত্যুকে তো দেখেনি? সে কি করে জানল যে তার ধর্ম বেঁচে থাকা এবং তার জন্যে তাকে খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্য গ্রহণ, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি জৈবিক ক্রিয়াকলাপ করে যেতে হবে? সে কি করে জানল যে সূর্যলোক থেকে শক্তি আহরণ করে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানির সাহায্যে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায়-মানুষ যার নাম দিয়েছে সালোক সংশ্লেষণ-তাকে খাদ্য প্রস্তুত করে বাঁচতে হবে এবং তার জন্যে তাকে তার নিজ দেহের মধ্যে ক্লোরোফিল সৃষ্টি করে নিতে হবে? সূর্যই যে শক্তির উৎস, কার্বন ডাই-অক্সাইড-ই যে তার খাদ্য প্রস্তুতের অন্যতম উপাদান–পানির মধ্যে জন্ম বলে পানিকে সে না হয় চিনল, আর ক্লোরোফিল যে ওভাবে খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম তাই বা সে জানলো কী করে? এই ক্লোরোফিলের স্রষ্টা কি প্রোটোপ্লাজম্ নিজেই না অন্য কেউ তার মধ্যে একে সৃষ্টি করে দিয়েছে? মৃত্যু সম্বন্ধে ও জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতাবিহীন

www.pathagar.com

সে কী করেই বা জানল যে, এভাবে খাদ্য প্রস্তুত না করলে এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না চললে অথবা অভিযোজন অর্জন না করলেই সে বেঁচে থাকতে পারবে না, মরবে? বলা হয় যে জীবনের ধর্মই বেঁচে থাকা বা বেঁচে থাকতে চেষ্টা করা, তাহলে বেঁচেই বা জীব থাকে না কেন, সে মরে কেন? আর এটাই বা সেই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ কি করে জানল যে প্রথমেই তাকে ক্লোরোফিলবিশিষ্ট উদ্ভিদ কোষে পরিণত হতে হবে? খাদ্য প্রস্তুত ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ কোষে পরিণত হওয়ার আগে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ কী খেয়ে বাঁচল এবং সে খাদ্যই বা সে পেল কি করে? সজীব পর্দা প্লাজমা মেমব্রেন দ্বারা আবৃত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ কী করেই বা তার নিজের দেহের চারদিকে নির্জীব সেলুলোজের কোষ প্রাচীর উৎপন্ন করল? পরিবেশের পরিবর্তন কেন হলো? যে ভৌত পরিবেশ এ যাবৎকাল জীব উদ্ভবের অনুকূলতার দিকে পরিবর্তিত হয়ে আসছিল তাই বা কেন জীবের জীবন ধারণের প্রতিকূলতার দিকে পরিবর্তিত হলো যাতে অভিযোজিত না হলেই জীবের তথা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না? পরিবর্তিত পরিবেশের দরুণ প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ যখন ক্লোরোফিলবিশিষ্ট উদ্ভিদ কোষে পরিণত হলো তখন পৃথিবীর সব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এরই তো উদ্ভিদ কোষে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু সত্যই কি তা হয়েছিল? কেউ কেউ বলেন যে, ক্লোরোফিলবিশিষ্ট উদ্ভিদ কোষই পরে মিউটেশান অর্থাৎ "বড় ধরণের আকস্মিক পরিবর্তন"-এর মাধ্যমে ক্লোরোফিল বর্জন করে প্রাণীকোষে পরিণত হয়। এখানেও ওই একই প্রশ্ন, সে কি করে জানল যে, তাকে প্রাণীকোষে রূপান্ত রিত হয়ে প্রাণীজগতের উদ্ভবের দিকে বিবর্তিত হতে হবে? উদ্ভিদ কোষের নির্জীব সেলুলোজের কোষ প্রাচীরের পরিবর্তে সেখানে সজীব প্লাজমা মেমব্রেনের কোষপর্দা এলো কীভাবে? উদ্ভিদ কোষ থেকে যখন প্রাণীকোষের উদ্ভব হলো তখন সব এককোষী উদ্ভিদেরই তো প্রাণীকোষে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার কথা, কিছু আবার উদ্ভিদ কোষ হিসাবেই থেকে গেল কেন? যদি তাই হয় তবে এ তো স্পষ্টত এই জন্যেই যে, সেই সব উদ্ভিদ কোষ থেকে উদ্ভিদ জগত বিবর্তিত হবে। কিন্তু জীব জগতকে যে উদ্ভিদ ও প্রাণী এই দুইভাগে বিভক্ত হতে হবে এবং তার জন্যে কিছু এককোষী জীবকে উদ্ভিদ কোষ হিসাবেই থাকতে হবে এবং কিছুকে পরিবর্তিত হয়ে প্রাণীকোষে পরিণত হতে হবে একথা সেই প্রথমে উদ্ভূত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ বা পরবর্তী ক্লোরোফিলবিশিষ্ট উদ্ভিদ কোষ জানলো কি করে–যার জন্যে সে নিজে থেকে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল? যে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ পরিবর্তিত পরিবেশে বাঁচার প্রয়োজনে ক্লোরোফিলবিশিষ্ট উদ্ভিদ কোষে পরিণত হয়েছিল তাই আবার পরিবেশ অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও কেন মিউটেশানের

www.pathagar.com

মাধ্যমে ক্লোরোফিল বর্জন করে প্রাণীকোষ উৎপাদন করল? এইসব এবং ইত্যাকার আরও সব প্রশ্নের উত্তর এক সচেতন, উদ্দেশ্যময় ও কুশলী স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বীকৃতিবিহীন বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ দিতে পারে না। বিজ্ঞান অবশ্য এ সবের একটা প্রক্রিয়াগত উত্তর দিতে পারে কিন্তু এর হেতুগত কোনও উত্তর দিতে পারে না। অর্থাৎ বিজ্ঞান "কীভাবে হয়"-এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে কিন্তু "কেন হয়"-এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে না ওই "আপনা আপনিই হয়" বলা ছাড়া, যা আমরা আগেই দেখেছি, হওয়া অসম্ভব। বিবর্তনবাদের প্রতি স্তরে তাই আমরা অনুভব ও প্রয়োজন বোধ করি সেই স্রষ্টার উপস্থিতির যিনি সবকিছু ঘটিয়ে চলেছেন তাঁর নিজের ইচ্ছায় ও তাঁর নিজ ক্ষমতায় ও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য। অর্থাৎ পূর্বের যে পদক্ষেপটি তিনি গ্রহণ করেছেন তা করেছেন স্পষ্টত পরবর্তী ধাপে উপনীত হওয়ার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, অন্ধ ও উদ্দেশ্যহীনভাবে "আপনা আপনিই" কিছুই ঘটেনি। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেখানে আছে সেখানে তার পশ্চাতে সচেতনতা অবশ্যই আছে যা জড়ের ধর্ম নয়। অতএব, জীবের তথাকথিত উদ্ভব থেকে শুরু করে কোনও স্তরেই এবং কোনক্রমেই বিবর্তন আপনা থেকেই ঘটতে পারে না, সচেতন ও উদ্দেশ্যময় কেউ একজনকে তা ঘটিয়ে চলতে হয়। আর তাছাড়া বিবর্তন যদি পরিবেশের পরিবর্তনজনিত কারণে নিছক অন্ধভাবে এবং আপনা থেকেই সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে আজ পৃথিবীর বুকে একটিও আদিম জীব, যথা–প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌, প্রাককেন্দ্রিক কোষ, নীলাভ সবুজ শৈবাল, এ্যামিবা প্রভৃতি সহ নিম্নস্তরের কোনও জীবেরই অস্তিত্ব থাকার কথা নয়, সবই বিবর্তিত হয়ে অন্যতর ও যোগ্যতর প্রজাতিসমূহের জীবে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার কথা! কিন্তু প্রকৃতিতে যোগ্যতর ও উচ্চস্তরের জীবসমূহের পাশাপাশী আজও এসব নিম্নস্তরের জীব টিকে আছে-অযোগ্যতর যাদের জীবন সংগ্রামে হেরে গিয়ে অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারই কথা। এরূপ কি করে হলো?

এক কোষবিশিষ্ট জীব থেকে বহু কোষবিশিষ্ট জীবের কথিত "আপনা আপনিই" উদ্ভবকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলেও আমরা এই একই ধরনের সব প্রশ্নের সম্মূখীন হই–যে সব প্রশ্নের উত্তর স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বীকৃতিবিহীন বিবর্তনবাদে নেই। একটা এ্যামিবা যখন বংশবিস্তার করে তখন উহা বিভক্ত হয়ে দুটো স্বতন্ত্র এ্যামিবা হিসাবে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং পৃথক জীব হিসাবেই তারা বাঁচতে ও কর্ম করতে থাকে। কিন্তু একেবারে প্রথমে উদ্ভূত এককোষী জীবটি যখন বহু কোষবিশিষ্ট জীবের উদ্ভবের জন্য

www.pathagar.com

বিভক্ত হলো তখন দেখা যায় যে, বিভক্ত হয়েও কোষগুলো একত্রে গ্রথিতই থাকল–পৃথক হয়ে গেল না। এককোষী সেই আদিম জীবটি তো জানে না যে তাকে বহুকোষী জীবে পরিণত হতে হবে, সুতরাং বিভক্ত হয়েও কোষগুলোকে ঐক্যবদ্ধই থাকতে হবে, পৃথক হয়ে যাওয়া চলবে না। তাহলে বিভক্ত হয়েও তারা পৃথক হয়ে গেল না কেন? যৌন প্রজনন হয় যে সব জীবে তাদের ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী জননকোষের মিলনের মাধ্যমে যে জাইগোট উৎপন্ন হয় তাও একটি এককোষী জীবই। কিন্তু সে যখন বিভক্ত হতে হতে বহুকোষবিশিষ্ট হয় তখন আমরা দেখি যে, কোষগুলো সব একসঙ্গে গ্রথিতই থাকে, পৃথক হয়ে যায় না; এবং আরও আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোষগুলোর মধ্যে কাজেরও বিভাগ হয়; এক একটি বা এক এক দল কোষ এক এক রকমের কাজ করে এবং এভাবেই তারা বিভিন্ন কলা ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করে। এই কাজের বিভাগ কে করে দেয়, যখন কোষগুলো নিজেরা জানে না যে, এইভাবে কাজের বিভাগের মাধ্যমে তাদেরকে উচ্চতর বহুকোষী জীবদেহে পরিণত হতে হবে? জীবটির বিশেষ দৈহিক গঠন বা আকারই বা কী করে হয়? কোষের বিভক্তি এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পৌঁছে বিভাগ থেমে গিয়ে জীবটিকে একটা সীমিত আকারই বা দেয় কেন? কেন তা আরও বড় হয় না, কিংবা ছোটই থাকে না? এ সবই কি তার ভাবী পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ওই এককোষী জাইগোটটির নিজস্ব কর্মতৎপরতার ফল, নাকি অপর কেউ অলক্ষ্যে থেকে তাকে দিয়ে ওসব করায়? মানুষের জাইগোট থেকে মানুষ, গরুর জাইগোট থেকে গরুই উদ্ভূত হয়, অপর কিছু হয় না। এ সবই কি জাইগোট নিজে নিজেই করে? বিজ্ঞান অবশ্য বলে যে, এই সব জ্ঞান ও তথ্য DNA-এর মধ্যেই নিহিত থাকে। এবং এই DNA-ই সবকিছুকে সেইভাবেই নিয়ন্ত্রিত করে, ঠিক কম্পিউটারে যেভাবে তথ্য বা Data দেয়া থাকলে তা থেকে সমাধান বা উত্তর বের হয়ে আসে তেমনি। কিন্তু কম্পিউটার তো স্বয়ং সৃষ্ট নয় এমন একটি জড় পদার্থ এবং তা একজন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ও বৈজ্ঞানিক মানুষের তৈরি এবং তা নিজে থেকে তথ্যও সৃষ্টি করে না। যে তাকে বানায় বা যে তাকে পরিচালিত করে সেই বুদ্ধিমান সত্ত্বাটি তার মধ্যে তার সৃষ্টি করা তথ্য সরবরাহ করলে তবে কম্পিউটার সে সবের উত্তরের যোগান দিতে পারে, অন্যথায় নয়। তেমনিভাবে DNA-ও তো নির্জীব জড় পদার্থ-বিধায় স্বয়ং সৃষ্টও নয় এবং সেও ওই সব জ্ঞান ও তথ্য সৃষ্টি করে না এবং সেও ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহলে সে কীভাবে সৃষ্ট হলো এবং সে ভবিষ্যত সম্বন্ধীয় ওই সব জ্ঞান ও তথ্যই বা কোথা থেকে পেল যদি অন্য কোন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মহাবিজ্ঞানী সেই DNA-কে সৃষ্টি না

www.pathagar.com

করে থাকেন এবং তার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সেই মহাবিজ্ঞানী সত্ত্বা জড় DNA-এর মধ্যে যদি সেই সব Data বা তথ্য এবং তার উত্তর এবং সে উত্তর দেয়ার ক্ষমতা তার মধ্যে সরবরাহ করে না দিয়ে থাকেন?

একলিঙ্গী জীবের যৌন প্রজনন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও যে কথাটি এখানে না বললেই নয় তা হচ্ছে কোষের ক্রোমোজোম সম্পর্কে। কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রত্যেক জীবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। জড় জগতে মৌলিক কণিকাসমূহের সংখ্যা ও সজ্জা যেমন প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর, তথা সেই মৌলিক পদার্থটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, জীব জগতেও তেমনি কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রত্যেক প্রজাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যে সমস্ত জীবে যৌন প্রজনন হয় তাদের দেহে দুই প্রকার কোষ থাকে, যথা, দেহ কোষ ও জনন কোষ। অন্যতম একটি একলিঙ্গী জীব মানুষের দৃষ্টান্ত নিয়ে ব্যাপারটি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। একটি মানবদেহে দুই প্রকারের কোষ থাকে। জাইগোট থেকে শুরু করে দেহ গঠন কার্যে যে সব কোষ অংশগ্রহণ করে তাদের সবগুলোকেই বলে দেহ কোষ। জাইগোটসহ এদের সকলের নিউক্লিয়াসেরই ক্রোমোজোম সংখ্যা হচ্ছে ৪৬টি বা ২৩ জোড়া। জাইগোটের ৪৬টি ক্রোমোজোমের ২৩টি আসে পিতার শুক্রাণুর মাধ্যমে ও ২৩টি আসে মাতার ডিম্বাণুর মাধ্যমে। এই শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে জনন কোষ বলা হয়। এরা প্রত্যেকেই যথাক্রমে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের যে সব কোষ থেকে শুক্রকীট ও ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়, একটু বিশেষ ধরণের হলেও তারা সব দেহ কোষই; কারণ তাদের প্রত্যেকের ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৩ জোড়াই। সব দেহ কোষেরই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে ২২ জোড়া ক্রোমোজোম এক ধরনের, এদেরকে বলা হয় অটোজোম, আর, এক জোড়া ক্রোমোজোম অন্য ধরনের। এই এক জোড়াকে বলা হয় যৌন ক্রোমোজোম। পুরুষের ক্ষেত্রে এ দুটোকে চিহ্নিত করা হয় XY এবং নারীর ক্ষেত্রে এ দুটোকে চিহ্নিত করা হয় XX দ্বারা। XY হচ্ছে পুংলিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম এবং XX হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম। দেহ গঠন ও দৈহিক বৃদ্ধি বা দেহের ক্ষয় পূরণের কারণে নতুন কোষ উৎপাদনের জন্য যখন পূর্ব বিদ্যমান দেহ কোষের বিভাজন হয় তখন ৪৬টি ক্রোমোজোমবিশিষ্ট একটি দেহকোষ থেকে যে দুটো কোষ উৎপন্ন হয় তাদের প্রত্যেকেরই ক্রোমোজোম সংখ্যাও ৪৬-ই থাকে। অর্থাৎ কোষ বিভাজনের সময় উহার প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমও বিভক্ত হয়ে যায়। এই পদ্ধতির কোষ বিভাজন-যাতে সন্তান কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার

www.pathagar.com

সমানই থাকে তাকে বলে মাইটোসিস। কিন্তু শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের শুক্রকীট ও ডিম্বাণু উৎপাদনকারী বিশেষ ধরনের এক একটি দেহকোষ থেকে যখন দুইটি করে এইসব জননকোষ উৎপন্ন হয় তখন বিশেষ অন্য এক ধরনের কোষ বিভাজন হয়, যাকে বলা হয় মিওসিস। এতে ৪৬টি ক্রোমোজোম সমান দুইভাগে বিভক্ত হয়ে উৎপন্ন দুইটি জননকোষের প্রত্যেকটিতে ২৩টি করে ক্রোমোজোম যায়। শুক্রাশয়ের একটি কোষ থেকে যে দুটো শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তাদের একটিতে থাকে ২২টি অটোজোম ও একটি X যৌন ক্রোমোজোম ও অপরটিতেও থাকে ২২টি অটোজোমই কিন্তু একটি Y যৌন ক্রোমোজোম। কারণ মূল কোষটিতে ছিল ৪৪টিই অটোজোম কিন্তু একটি X ও অপরটি Y যৌন ক্রোমোজোম। তেমনি ডিম্বাশয়ের একটি ডিম্বাণু উৎপাদনকারী কোষ থেকে যখন দুটো ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় তখন তাদের প্রত্যেকটিতে থাকে ২২টি করে অটোজোম ও একটি করে X যৌন ক্রোমোজোম; স্মর্তব্য যে, নারীদেহের কোষে কোনও Y ক্রোমোজোম নাই-ই। অতএব দেখা যায় যে নিষিক্ত হওয়ার সময় যদি X ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় তবে উৎপন্ন জাইগোটের ক্রোমোজোম হবে (২২+২২) বা ৪৪টি অটোজোম এবং দুইটি XX যৌন ক্রোমোজোম-একটি শুক্রাণুর অর্থাৎ পিতার ও অপরটি ডিম্বাণুর অর্থাৎ মায়ের; এই সন্তান হবে মেয়ে, কারণ নারীর যৌন ক্রোমোজোম হচ্ছে XX।

পক্ষান্তরে, ডিম্বাণুটি যদি Y ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয় তবে উৎপন্ন জাইগোটের ক্রোমোজোম বিন্যাস হবে (২২+২২) বা ৪৪টি অটোজোম ও একজোড়া XY ক্রোমোজোম, X টি মায়ের ও Y টি পিতার; এ সন্তান হবে ছেলে, কারণ পুরুষের যৌন ক্রোমোজোম হচ্ছে XY। সুতরাং দেখা যায় যে, সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ একেবারে নিষেকের সময়েই হয় এবং তাতে একমাত্র ভূমিকা হচ্ছে শুক্রাণুর, তথা পুরুষের; সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে নারীর কোনও নির্ধারকের ভূমিকা নাই। নিষেক ক্রিয়ায় পুরুষের Y ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রকীট সরবরাহ করার ব্যর্থতাই কন্যা সন্তান জন্মের কারণ; কারণ প্রকৃতিগতভাবেই স্ত্রীর Y ক্রোমোজোম সরবরাহ করার ক্ষমতাই নাই। সুতরাং যে সব স্বামী কন্যা সন্তান জন্মের জন্য স্ত্রীকে দোষারোপ বা দায়ী করেন তাঁদের এরূপ করা অন্যায়। কারণ ব্যর্থতা আসলে তাঁরই, স্ত্রীর নয়। আর তাছাড়া, সূক্ষ্ম বিচারে দায়ীত্ব পুরুষেরও নয়। কারণ, পুরুষের একবারে নিক্ষিপ্ত বীর্যমধ্যস্থ প্রতি মিলি লিটার বীর্য্যমধ্যের বারো কোটি শুক্রকীটের মধ্যে অর্ধেক X ক্রোমোজোম বিশিষ্ট এবং অর্ধেক Y ক্রোমোজোম বিশিষ্ট; এদের ঠিক কোন্‌টি দ্বারা যে স্ত্রীর

www.pathagar.com

এক 'ঋতুচক্রে' নিষেকের জন্য পরিপক্ক ও প্রস্তুত একটি মাত্র ডিম্বাণুটি নিষিক্ত হবে তা নিছক চান্স-এর ব্যাপার নয়-তা সম্পূর্ণ এক বহিঃশক্তি দ্বারা নির্ধারিত। এ শক্তি কি মহাবিজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা নন? এখানে অবশ্য মিশ্র লিঙ্গ (Annomalous Sex) বিশিষ্ট সন্তানের একটি ব্যতিক্রম সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু এই সব ব্যতিক্রমই তো সেই স্রষ্টার সর্বশক্তিমানত্ব ও সর্বপ্রকার নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে তাঁর নিজ ইচ্ছার ও তদনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতাকে আরও সপ্রমাণ করে।

কথায় কথায় আমরা বোধ হয় অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম। এবার আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আমরা বলছিলাম যে, শুক্রকীট ও ডিম্বাণু উৎপন্ন হওয়ার সময় মিওসিস পদ্ধতির কোষ বিভাজন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হয়? স্পষ্টতঃই এটা এই কারণেই হয় যে, শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে যে জাইগোট উৎপন্ন হবে তার ক্রোমোজোম সংখ্যা যাতে ৪৬-ই হয়, সে যাতে মানুষই হয়। অন্যথায়-অর্থাৎ শুক্রকীট ও ডিম্বাণু উৎপাদনের সময়ও যদি সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ মাইটোসিস পদ্ধতিতেই কোষ বিভাজন হতো তাহলে উৎপন্ন শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর প্রত্যেকেরই ক্রোমোজোম সংখ্যা হতো ৪৬টি করেই এবং তাই তাদের মিলনের ফলে উদ্ভূত জাইগোটের ক্রোমোজোম সংখ্যাও হতো (৪৬+৪৬) বা ৯২ টি। সে সন্তান মানুষ হতো না, হতো অন্য কিছু; কারণ মানব কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬, ৯২ নয়। স্মর্তব্য যে, সঠিক বিচারে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুও কিন্তু মানব কোষ নয়। কারণ, মানব কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা হচ্ছে ৪৬ অথচ শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৩। এই কারণে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ঠিক ঠিক হিসেব মিল করে ব্যতিক্রমীভাবে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে মনুষ্য দেহ কোষ থেকে মনুষ্যেতর বৈশিষ্ট্যের ক্রোমোজোম সংখ্যা বিশিষ্ট শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর উৎপাদন এ কি আপনা আপনিই হতে পারে? শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনকারী কোষেরা কি জানে যে, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু এই দুই এর মিলনেই সন্তান উৎপন্ন হবে এবং তাই তাদের মিলনের দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হবে সে সন্তানের ক্রোমোজোম সংখ্যা যাতে ৪৬-ই থাকে সেই জন্যে তাদেরকে ২৩ ক্রোমোজোম বিশিষ্ট এই সব জনন কোষ উৎপাদন করতে হবে এবং তাই তাদেরকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমী মিওসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে এইসব অমানব কোষ উৎপাদন করতে হবে যাতে করে দুই এর মিলন দ্বারা একটা মানব কোষ বা মানুষের জাইগোট উৎপন্ন হয়? আসলে তারাও তা জানেনা, এমন কি তাদের অধিকারী মানুষটি কিংবা জড় প্রকৃতিও তা জানে না। অথচ যে কোনও ধরণের গাণিতিক হিসাব ও তদনুযায়ী ক্রিয়া একমাত্র কোন সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি ও

www.pathagar.com

ভবিষ্যত সম্বন্ধীয় জ্ঞান থেকে জাত হতে পারে বলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এটা অবশ্যই কোনও এক ভবিষ্যদ্দর্শী মহা পরিকল্পনাকারী ও মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা সত্ত্বা ব্যতীত সম্ভব হতে পারে না এবং হয় না। তাই, এখানেও আমরা সেই স্রষ্টারই দেখা পাই, যিনি, সম্ভবত এই হিসেব করে জনন কোষ উৎপাদনের ব্যাপারটির প্রতি ইঙ্গিত করেই অতি সঙ্গতভাবেই মানুষের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, "অতএব তোমরা কি শুক্রবিন্দু সম্বন্ধে লক্ষ্য করেছ? তবে কি তোমরাই উহা সৃষ্টি করেছ না আমিই সৃজনকারী? (৫৬ ঃ ৫৮-৫৯)

উপরে আমি যা বলেছি সমস্ত একলিঙ্গী জীবের বংশ বিস্তার এই পদ্ধতিতেই হয়। অবশ্য, আমি আগেই বলেছি, "নিম্নশ্রেণীর একজাতের বিড়াল ও এক শ্রেণীর ধবধবে সাদা বেজীর ডিম্বাণু, শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হওয়া ছাড়াই ঠিক নিষিক্ত হওয়ার মতই বিভাজিত হতে থাকে।" কোনও কোনও "শশকের বেলাতেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এমন অপুংজনি প্রজনন সম্ভব হয়েছে।" মানুষের ক্ষেত্রেও প্রতি তিনশো একুশ কোটি আটাশ লক্ষ গর্ভের মধ্যে একটি অপুংজনি অর্থাৎ পিতার শুক্রাণু ছাড়া গর্ভ হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন। এরূপ ক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বইটি গর্ভেই কন্যা সন্তান হয়; শতকরা মাত্র একটি গর্ভে পুত্র সন্তান হতে পারে, তবে তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিকলাঙ্গ। তবে সে যাই হোক, স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম এই সব গর্ভই এসবের পশ্চাতে অসীম কুদরত ও ক্ষমতাবিশিষ্ট আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্বই সপ্রমাণ করে। কারণ যা কিছুই স্বাভাবিক তার মধ্যেই একটা যান্ত্রিকতার বা স্বাভাবিকতার উপাদান-অর্থাৎ কোনও নিয়ন্তাহীনতার বা স্বয়ংক্রিয়তা ও 'আপনা আপনিই হয়'-এর ধারণা প্রচ্ছন্ন থাকে, আর যা কিছুই ব্যতিক্রম তার মধ্যেই থাকে যান্ত্রিকতা তথা স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত এমন কোনও একটি সর্বশক্তিমান সত্ত্বার অস্তিত্বের স্বীকৃতি বা ধারণা যে সত্ত্বা তাঁর অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার বলে তাঁর নিজ ইচ্ছা ও পরিকল্পণা বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সমস্ত নিয়ম-কানুনের স্বাভাবিকতাকে লন্ডভন্ড করে কোনও ঘটনা সৃষ্টি করেন, যেমন তিনি করেছিলেন মা মরিয়মের অপুংজনি গর্ভধারণ ও বিনা পিতায় ইসা (আঃ)-এর জন্মের ক্ষেত্রে। এখানেও আমরা আবার সেই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা ও নিয়ন্তার সাক্ষাৎ পাই, যাঁর সাক্ষাত আরও পাই নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সাতদিনের জীবনে ও আরও পাই বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত সর্বাধুনিক Big Bang বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে।

অতএব, বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ সহ পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব বিষয়ক বিজ্ঞানের তিনটি মতবাদই ভ্রান্ত, কারণ তারা কেউই স্রষ্টাকে স্বীকার করে না এবং সবকিছুই 'আপনা আপনিই' হয়েছে বলে মনে করে; অথচ জীবজগতের

www.pathagar.com

উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে তাদের দেয়া ব্যাখ্যা প্রচেষ্টার প্রতি স্তরে সে স্রষ্টার প্রয়োজনের অপরিহার্যতা অনুভূত হয়। তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছাড়া সে সবকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং আল কোরআনের মাধ্যমে ইসলাম জীব সৃষ্টি এবং জীবের বিবর্তন সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছে তাই সঠিক, যে ইসলাম স্বীকার করে যে, জীবের প্রথম সৃষ্টি ও তার সর্ব প্রকার বিবর্তনের পশ্চাতে একজন কৃশলী, সচেতন ও উদ্দেশ্যময় স্রষ্টা আছেন যিনি ক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে এসব কিছুর পশ্চাতে কর্মরত আছেন এবং সে বিশ্বাস করে যে, মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার এক বিশেষ সৃষ্টি, যে মানুষ হিসাবেই সৃষ্ট যার আর কোনও বিবর্তন নেই বা হয়নি এবং প্রথম সৃষ্টির পর থেকেই যে অপরিবর্তিতই আছে এবং পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত ও তাই-ই থাকবে। শুধুমাত্র, "এসব কিছুই আপনা আপনিই হচ্ছে" এই কথা দ্বারা সচেতন মানবতাকে আর ধোকা দেয়া যাবে না; কারণ ও কথা যুক্তিতে টেকেনা। তাছাড়া নাস্তিকের কোনরকম যুক্তি প্রমাণ বিহীন কেবলমাত্র "নাই" কথাটির বিরুদ্ধে আস্তিকের, তথা ইসলামের "আছে"-র স্বপক্ষে এত সব শানিত যুক্তি ও "নিদর্শন" আছে যে, যে কারও পক্ষেই সে সবকে অস্বীকার করা বা উপেক্ষা করে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই, যে বিজ্ঞানকে এ যাবৎকাল নাস্তিক বলে মনে করা হতো সেই বিজ্ঞানের অনেক সাধকই এখন পরম আস্তিকে পর্যবসিত হয়েছেন ও হচ্ছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার মত চরম নাস্তিক্যবাদী দেশও এখন ধর্মকে রাষ্ট্রীয়ভাবেই অনুমোদন দান করছে এবং প্রকারান্তরে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনছে। আল্লাহ্ করুন এমন দিন যেন শীঘ্রই আসে যখন তাঁর সৃষ্ট সব মানুষ তাদের সর্বপ্রকার বিজ্ঞান সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্কে খুঁজে পায় এবং জীব সৃষ্টি ও জীবের বিবর্তন এবং মানবসৃষ্টি সহ "আসমান জমিনের সৃষ্টি ব্যাপার ও দিনরাত্রির পরিবর্তন"-এর মধ্যে যারা "দাঁড়ানো, বসা এবং পার্শ্বপরি (শায়িত) অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে এবং বলে যে, হে আমাদের রব, তুমি এ সবকিছু বৃথাই সৃষ্টি করনি, পবিত্রতা তোমারই, তুমি আমাদেরকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা কর।" (৩ ঃ ১৯০-১৯১), সেই সব "জ্ঞানবান মানুষদের জন্য যে সব নিদর্শন রয়েছে" সেই নিদর্শনসমূহের মধ্যেই যেন এ সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখতে পায় এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত দম্ভ অহংকার বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পিতভাবে তাঁর কাছেই ফিরে আসে। কারণ, আমাদের সকলেরই সর্বশেষ পরিণতি সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা তো এই যে, "অবশ্যই আমরা সকলেই তো আল্লাহ্রই জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন" (২ ঃ ১৫৬)।

www.pathagar.com

উপসংহার

নামকরণ থেকেই স্পষ্ট যে, অত্র গ্রন্থ জীবজগতের অস্তিত্বায়ন সম্পর্কে লৌকিক বিজ্ঞান ও পবিত্র আল কোরআনের বক্তব্যসমূহ সম্পর্কীয় একটি আলোচনা। সুতরাং এতে আমি মানুষসহ সমস্ত জীবজগতেরই অস্তিত্বায়ন কীভাবে হয়েছিল এবং কীভাবে তারা বংশ পরম্পরাগতভাবে অস্তিত্বশীল থাকছে সেই সম্পর্কেই বিজ্ঞান ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে আলোচনা করেছি। এইসব জীবের শেষ পরিণতি কি? মৃত্যুতেই তাদের জীবনের শেষ তো অবশ্যই [আল কোরআন (৩ঃ১৮৫)] কিন্তু তারপরেও তাদের জীবন আছে কিনা সে সম্বন্ধে কারও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কেই কোনও আলোচনা আমি করিনি। কারণ গ্রন্থের উদ্দেশ্য তা নয়। অথচ এ বিষয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে মৃত্যুর পরেও কি জীবের জীবন আছে এবং থাকলে তা কীরূপ? সে কারণেই গ্রন্থের একটি উপসংহার সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি এবং আমি এ সম্বন্ধেই-বিস্তারিত নয় সংক্ষিপ্ত-একটি আলোচনা পাঠকের জিজ্ঞাসু মনের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি।

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে অত্র গ্রন্থে মানুষসহ অন্যান্য জীবের অস্তিত্বায়ন কীভাবে হয়েছিল সে সম্বন্ধে বলা হলেও আল্লাহ্ তায়ালার অপর সৃষ্টি যে জ্বীন জাতি তাদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। লৌকিক বিজ্ঞান তো জ্বীন জাতির অস্তিত্বই স্বীকার করে না। সুতরাং সে বিজ্ঞান তো সে জ্বীন জাতির অস্তিত্বায়ন কীভাবে হয়েছিল-সৃষ্টির মাধ্যমে, স্বতঃঅস্তিত্বশীল বা উদ্ভব হওয়ার মাধ্যমে হয়েছিল, না অনাদিকাল থেকেই তারা আছে সে সম্বন্ধে কিছুই বলে না বা বলেনি। অবশ্য 'অনাদিকাল' শব্দটিও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি ভ্রান্ত শব্দ, কারণ বিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিং-এর বিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক সর্বশেষ 'বৃহৎ বিস্ফোরণ' (Big bang) তত্ত্ব মোতাবেক কাল (Time) একটি সৃষ্ট সত্ত্বা [ইহা অনাদি নয়, অনাদি সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহ্ই (আল কোরআন-৫৭ ঃ ৩)] বৃহৎ বিস্ফোরণের আগে যার অস্তিত্বই ছিল না এবং যা ওই বৃহৎ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্ট হয়েছিল, যেমন স্থান (Space)-ও সৃষ্ট হয়েছিল ঠিক ওই মুহূর্তেই, যারও অস্তিত্ব তার আগে ছিল না। ঠিক ওই মুহূর্তেই সৃষ্ট হয়েছিল এদেরই অস্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও দুইটি সত্ত্বা-ঘটনা (Phenomenon) ও বস্তু (Matter)-যারাই যথাক্রমে প্রকাশ করে

www.pathagar.com

কাল (Time) ও স্থান (Space)-কে; কারণ ঘটনা না ঘটলে যেমন কালকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না তেমনি বস্তুর অবস্থানের ক্রম ছাড়া স্থানও কিছুই নয়। যেহেতু Big bang-ই বিশ্বের প্রথম ঘটনা এবং তার মাধ্যমেই সৃষ্ট হয় বিশ্বের প্রথম বস্তু সুতরাং ওই সময়েই সৃষ্ট হয় কাল এবং স্থানও। সোজা কথায় Big bang-এর আগে স্থান, কাল এবং বস্তু, ঘটনা কিছুই ছিল না অর্থাৎ যখন বিশ্বই ছিল না, কারণ স্থান-কাল-বস্তু-ঘটনা এরাই তো বিশ্বের গঠনকারী একক; অর্থাৎ Big bang-এর মাধ্যমেই বিশ্বের শুরু। অতএব প্রশ্ন হয় যে তাহলে তার আগে কি ছিল বা কে ছিল? বিজ্ঞান যদিও অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তরে বলে দেয় যে, "তার আগে কেউ ছিল না, কিছুই ছিল না" কিন্তু সে উত্তর বিজ্ঞানের যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ ওই উত্তরের পৃষ্টেই আবার প্রশ্ন হয় যে, তার আগে যদি কেউ ছিল না এবং কিছুই ছিল না তাহলে বিস্ফোরণটা হলো কিসের এবং তা ঘটালই বা কে? যখন আমরা দেখি যে কোনও বিস্ফোরক পদার্থ বা বিস্ফোরণকারী ছাড়া একটা ম্যাচ কাঠীর বিস্ফোরণ এবং ডিনামাইট এর বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে একটা পারমাণবিক, নিউক্লিয়ার বা নিউট্রন কোনও বোমারই বিস্ফোরণ হয় না; আর Big bang-ও এত সুক্ষ্ম ও স্বল্প সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যা মানবিক কল্পনারও অতীত। এই সময়টা যে কত সুক্ষ্ম তার একটা গাণিতিক ধারণা আমরা এভাবে দিতে পারি যে বৃহৎ বিস্ফোরণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মহাবিশ্বের আয়তন ছিল বলা যায় (প্রায়) ০-একটি বিন্দুর চাইতেও ছোট এক অবস্থায় যার মধ্যে প্রলয়কাল পর্যন্ত বিশ্বের সবকিছু জমাট বাঁধা অবস্থায় জোটবদ্ধ ছিল এবং তার ঘনত্ব ছিল কল্পনাতীত! ওই মুহূর্তের বিশ্বের অবস্থা কল্পনাতীত অবশ্যই তবে তার পরের কিছু অবস্থার বিবরণ বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে দিয়েছেন। বৃহৎ বিস্ফোরণের পরবর্তী $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড সময়কে বলা হয় প্লাংক সময় (Plank Time), এটা বিজ্ঞানী Max Plank-এর নাম অনুসারে। এটা এমন একটা সময় যার পরিমাণ ১-এর ডাইনে ৪৩টি শূন্য দিলে যা হয় এক সেকেন্ডের তত ভাগের একভাগ মাত্র! পাঠক কি কল্পনা করতে পারেন সময়টা? ওই Plank Time-এ মহাবিশ্বের ব্যাস ছিল $১০^{-৩৩}$ সে. মি.। অর্থাৎ মহা বিস্ফোরণের মুহূর্ত থেকে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পরে মহাবিশ্বের আয়তন শূন্য থেকে বেড়ে $১০^{-৩৩}$ সে. মি. হলেও মহা বিস্ফোরণের সময় তার আয়তন ছিল ০ (শূন্য)-ই; তাহলে বিস্ফোরণটা হয়েছিল কিসের তখন তো বস্তুই ছিল না? আর এই Plank Time-এ মহাবিশ্বের বস্তুর ঘনত্ব ছিল ৩×১০^{৯৩} গ্রাম/সি.সি. বা ১.৯×১০^{৮৫} টন/ইঞ্চি^{৩}-মোটামুটিভাবে বলা যায় ওই সময়ে ১ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি চওড়া এবং ১ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট একটুখানি বস্তুর ভর ছিল ১-এর ডাইনে ৮৫টি

www.pathagar.com

শূন্য দিলে যা হয় ১.৯×তত টন! যে জমাট বস্তুপিণ্ডকে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে তার ভেতরের সবকিছুকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এ বিশ্বের সৃষ্টি সম্পন্ন করেন এবং এখনও করেই চলেছেন কারণ সৃষ্টি একটি চলমান প্রক্রিয়া-মহাসংকোচন তথা বিশ্বের প্রলয় পর্যন্ত যা চলবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমান ও জমিন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম;" (আল কোরআন, ২১ঃ৩০)। সেই বৃহৎ বিস্ফোরণের ১৫০০ কোটি বছর পর আজ মহাবিশ্বের আয়তনাদি কত? আজ এই মহাবিশ্বের পরিধি ২১৯৮০ কোটি আলোকবর্ষ এবং এর পদার্থের ঘনত্ব $১০^{-২৮}$ গ্রাম/সি.সি. আর ভর হচ্ছে ৬×১০^{১৪} টন! (এক আলোকবর্ষ=৫.৮×১০^{১৩} মাইল প্রায়)।

যাহোক, বলছিলাম যে, তাহলে স্থান-কাল-বস্তু-ঘটনা কিছুই যখন ছিল না তখন Big bang-এর সেই প্রথম বিস্ফোরণ-যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল স্থান-কাল-বস্তু-ঘটনাবিশিষ্ট এই বিরাট বিশ্বের-যার জের এখনো চলছেই মহাবিশ্বের বস্তুপিণ্ডসমূহের ক্রমাধিক মাত্রার প্রচণ্ড গতিবেগে পরস্পর থেকে দূরে ছুটে চলার মাধ্যমে, সোজা কথায়, বিশ্ব যখন প্রসারিত হয়ে চলেছে (Expanding Universe-Sir James Jeans) সেই বিস্ফোরণটি ছিল কিসের এবং তা ঘটিয়েছিল কে?-কারণ বিজ্ঞানই বলে যে বিস্ফোরক পদার্থ ও বিস্ফোরণকারী ছাড়া কোনও বিস্ফোরণই ঘটতে পারে না-অথচ তখন কোনও পদার্থও ছিল না এবং কোনও মানুষ বিজ্ঞানীও বিশ্বে ছিল বলে প্রমাণ নেই? আর সে সময়ে যে মহাবিশ্বে কোনও বস্তুও ছিল না তাও এ থেকেই আরও প্রতিপন্ন হয় যে, সব বিজ্ঞানীই এ বিষয়ে একমত যে, মহাবিস্ফোরণ ঘটার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মহাবিশ্বের আয়তন ছিল ০ (শূন্য) (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-মূল ষ্টিফেন হকিং, বঙ্গানুবাদ শত্রুন্নজিৎ দাশ গুপ্ত, পৃ.-১২৮) এবং বিস্ফোরণটা ঘটেছিল ০ (শূন্য)-তে। কারণ এ বিষয়েও সব বিজ্ঞানীই একমত যে, "দৃশ্য সবকিছুই অদৃশ্য জিনিষ থেকে তৈরি এবং আল্লাহ্র আদেশই সমস্ত কিছুর সৃষ্টির কারণ" (বিশ্ব রহস্যে আইনস্টাইন-মূল লিংকন বার্নেট, বঙ্গানুবাদ এম. এ. জব্বার, এম. এস-সি., পৃ.-১৪২)।

বিশ্ব সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই ঠিক আল্লাহ্ শব্দটি এড়িয়ে চলেন এবং তাঁকে স্রষ্টা বলে উল্লেখ করেই শান্তি পান বলেই মনে হয়; অবশ্য কেউ কেউ God বা অন্য কিছুও বলেন। কারণ, এ বিষয়ের সব

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীই-মাত্র ড. আব্দুস সালাম বাদে-অমুসলমান বিশেষ করে ইহুদি, খৃষ্টান ও মুশরিক যাদের কাছে আল্লাহ্ শব্দটি ভয়ংকর এলার্জিক (Allergic)। তবুও উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখি যে, সব বিজ্ঞানীই স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন যে সবকিছুই নিছক তাঁর ইচ্ছেতেই-হাত; অবশ্যই মানবীয় ধরনের হাত নয়;-দ্বারা কৃত কোনও কাজের মাধ্যমে নয়-সৃষ্ট হয়েছিল।

বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে ইসলামও ঠিক একই কথাই বলে। একেবারে আদিতে-বিজ্ঞান যাকে মহা বিস্ফোরণ পূর্ব স্থান-কাল-বস্তু-ঘটনাহীন অবস্থা বলে-যখন সেই "স্রষ্টা" ছাড়া আর কিছু ছিল না-তখন ইসলামী পরিভাষার সেই লা-মাকান ও লা-জামান এর স্থানহীন ও কালহীন সুতরাং বস্তু ও ঘটনাহীন অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্ই ছিলেন। আল কোরআন বলেন, "তিনিই আদি ও তিনিই অন্ত" (৫৭ ঃ ৩)। অর্থাৎ বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে বিশ্ব সৃষ্টির আগেও তিনি ছিলেন, Big Crunch তথা মহা সংকোচনের (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ.-১৭৯) বা এক বিন্দুবৎ Black Hole (প্রাগুক্ত, পৃ.-১২৭) এর মাধ্যমে যখন তিনি বিশ্বজাহানে ছড়িয়ে পড়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত বস্তুপিণ্ডকে যখন জমাট বাঁধা এক ক্ষুদ্রবিন্দুতে গুটিয়ে আনবেন, এক কথায় বিশ্ব যখন ফুরিয়ে যাবে অবশ্য তাও যাবে "চক্ষের পলকে" (আল কোরআন-৫৪ ঃ ৫০) তথা প্রায় সেই ০ (শূন্য) সময়েই, তখনো তিনি থাকবেন-যে অবস্থার কথা পবিত্র আল কোরআন বলেন ২১ ঃ ১০৪, ২৮ ঃ ৮৮ ও ৫৫ ঃ ২৬-২৭ আয়াতসমূহে। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "সেদিন আমি আসমানকে এমনভাবে গুটিয়ে নেব যেমন লিখিত তাড়া গুটিয়ে নেওয়া হয়।" (২১ ঃ ১০৪); দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্র সত্ত্বা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল।" (২৮ ঃ ৮৮); সর্বশেষ আয়াত দ্বয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "জমিনের উপর যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল, আর অবশিষ্ট থাকবে শুধু আপনার 'রব'-এর সত্ত্বা, যিনি মহত্ব ও মহানুভবতার অধিপতি।" (৫৫ ঃ ২৬-২৭)। অর্থাৎ আল কোরআনের মতই বিজ্ঞানও স্বীকার করে যে মহাবিশ্বের এমন একটা অবস্থা এক সময়ে ছিল যখন বিশ্ব ছিল স্থান-কাল-বস্তু-ঘটনাহীন তথা অস্তিত্বহীন (Non-existent)।

উদ্ধৃত শেষোক্ত আয়াত ত্রয় স্বত ঃ স্পষ্ট হলেও প্রথমোক্ত আয়াতটি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত ইবনে আবক্ষাস (রাঃ) রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, "কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্ট বস্তু সহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী

www.pathagar.com

সব সৃষ্ট বস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ্ তায়ালার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে।" (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পৃ.-৮৯২)। লক্ষ্যণীয় যে, এখানে সপ্ত (সাত) শব্দটি বহুত্ববোধক এবং তাই আকাশ ও পৃথিবীর সংখ্যাও বহুই। তাছাড়া এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ), "আল্লাহ্ সাতটি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন" বলেও উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কোরআনের ৬৫ ঃ ১২ নং আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই আল্লাহ্ যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবীকেও।"-এখানেও সপ্ত বা সাত মানে বহু-ই। (আল্লাহ্ ভালো জানেন)। এতে বোঝা যায় যে Big bang-এর আগে বিশ্ব যেমন ০ (শূন্য) আকারের একটিমাত্র বিন্দুবৎ ছিল কেয়ামতের দিন Big crunch-তথা মহা সংকোচনের মাধ্যমে আল্লাহ্ বিশ্বের সবকিছুকে গুছিয়ে এবং গুটিয়ে (প্রায়) বিন্দুবৎ একটি Black Hole-এ (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ.-৯৫) পরিণত করবেন যে তা একটা সরিষার দানার মত আল্লাহ্র কুদরতী হাতে থাকবে যার কথা হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যায় যে সরিষার দানার কথা বলা হয়েছে তা একটি রূপক কথা মাত্র। আসলে মহাবিশ্বের আকার তখন প্রকৃতপক্ষে সরিষার দানার চাইতে অনেক-অনেক ছোট এমনকি Plank time-এর $১০^{-৩৩}$ সে. মি. ব্যাস এর চাইতেও ছোট হবে, Plank time-এ মহাবিশ্বের আকার তো অনেক বড় ($১০^{-৩৩}$ সে. মি. ব্যাস) হয়ে গেছে Plank time-এর $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড আগে অর্থাৎ Big bang-এর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এর আকার ০ (শূন্য)-ই ছিল! আসলে $১০^{-৩৩}$ সে. মি. ব্যাস বিশিষ্ট কোন দানা পবিত্র আল কোরআন অবতীর্ন হওয়ার সময়ের মানুষ তো দূরের কথা আজকেরই অধিকাংশ মানুষেরও উপলব্ধিযোগ্য নয় বলেই সম্ভবত পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) শস্যের ওই ক্ষুদ্রতম দানা সরিষার দানার কথার উল্লেখ করেছিলেন যা হজরত ইবনে আব্বাস রেওয়ায়েত করেছেন–যাতে ওই সময়ের বা সর্বকালের মানুষ মহাবিশ্বের ওই দিনের ওই ক্ষুদ্রতম আকারের কথা অনুধাবন করতে পারে। আসলে সেদিন মহাবিশ্ব তার Big bang-পূর্ব শূন্য (০) আয়তনের অবস্থায়ই ফিরে যাবে। (আল্লাহ্ ভাল জানেন)

যাহোক, বিশ্ব সৃষ্টির সেই আদি অবস্থায় একমাত্র সেই স্রষ্টা বা আল্লাহ্ই ছিলেন সেই স্থান-কাল-বস্তু-ঘটনাহীন অবস্থায়-এক অনাদি অনন্ত সচেতন উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাময় সত্ত্বা-যখন এ মহাবিশ্বই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ যখন এ বিশ্ব সৃষ্টির ইচ্ছে করলেন তখন তিনি "কুন" বা "হও" (২ ঃ ১১৭; ১৬ ঃ ৪০)

www.pathagar.com

নামের মুহূর্তেকের লক্ষ কোটি ভাগের একভাগের মহানাদের এক আদেশ বলে, যেমন আমি আগেই বিজ্ঞানীদেরও মত বলে উল্লেখ করেছি (বিশ্ব রহস্যে আইনস্টাইন, পৃ.-১৪২), সম্পূর্ণ অনস্তিত্বের মধ্যে থেকে (৪২ ঃ ১১) বিশ্ব সৃষ্টির এক বিন্দুবৎ আদিম অণুটি (বিশ্ব রহস্যে আইনস্টাইন, পৃ.-১২১) সৃষ্টি করেন (আল্লাহ্ ভাল জানেন) এবং অতঃপর মহাবিস্ফোরণের আকারে তারই এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে (প্রাগুক্ত) বিশ্বজাহানকে ছড়িয়ে দেন এবং দিচ্ছেন কারণ "তিনি প্রতি মুহূর্তেই এক নতুন বিষয়ে– অর্থাৎ নব সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত আছেন" (৫৫ ঃ ২৯)। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি গতিশীল (Dynamic), স্থবির (Static) নয়-প্রসারণশীল বিশ্ব (Expanding universe-Sir James Jeans ও পবিত্র আল কোরআন, ৫১ ঃ ৪৭)-এর আকারে আমরা এখন তাই দেখতে পাচ্ছি। উদ্ধৃত ২ ঃ ১১৭, ১৬ ঃ ৪০, ২১ ঃ ৩০, ৫১ ঃ ৪৭, ৫৫ ঃ ২৯, ৪২ ঃ ১১ ও ১২ ঃ ১০১ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ বলেন,

"তিনি আসমান জমিনকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী। তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছে করেন তখন বলেন হও, আর তাতেই হয়ে যায়।" (২ ঃ ১১৭)

"যখন আমি কোন কিছু করার ইচ্ছে করি তখন তার জন্যে আমার কথা শুধু এই যে তাকে বলি হও আর সে হয়ে যায়।" (১৬ ঃ ৪০)

"যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে আসমান ও জমিন পরস্পর সংবদ্ধ ছিল অতঃপর আমি তাদেরকে প্রমুক্ত করে দিলাম।" (২১ ঃ ৩০)

"আর আমি নিজ হস্ত দ্বারা আসমানকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তাকে প্রসারিত করে চলেছি।" (৫১ ঃ ৪৭)

"তাঁরই সমীপে প্রার্থনা করে আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা সকলেই। তিনি সর্বদা কোনও না কোনও নতুন বিষয়ে ব্যাপৃত আছেন।" (৫৫ ঃ ২৯)

"হে আসমানসমূহ ও জমিনের আদি স্রষ্টা।" (১২ ঃ ১০১)

এবং "তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আদি স্রষ্টা।" (৪২ ঃ ১১)-অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ অনস্তিত্বের মধ্য থেকে অস্তিত্বায়নকারী (Bringing forth of being from non-being)।

একটু আগেই "আল্লাহ্ যখন এ বিশ্ব সৃষ্টির ইচ্ছে করলেন" বলে আল্লাহ্র যে একটি ইচ্ছের কথা আমরা বললাম তা থেকে কেউ যেন একথা মনে না করেন যে, আল্লাহ্ তায়ালার এই ইচ্ছেটা তাঁর আভ্যন্তরীন কোন অভাববোধ থেকে জাত। কারণ একথা মানুষসহ সমগ্র জীবজগতের জন্য সত্য হলেও

www.pathagar.com

ইচ্ছাময় আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সত্য নয়; কারণ তা অনন্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা এবং তা আল্লাহ্‌র 'জাত'-এর সঙ্গে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য এবং তা কোন অভাববোধ থেকে জাত নয়; কারণ-আল্লাহ্ সর্বপ্রকার "অভাব রহিত, অমুখাপেক্ষী"। (১১২ ঃ ২)

যাহোক, বলছিলাম জ্বীন জাতির কথা। জ্বীনরা অনাদি নয়, স্বয়ম্ভূও নয় এবং স্বয়ং স্থিতিশীলও নয়; তারা সৃষ্ট। জ্বীনদের সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "এবং তিনি জ্বীন জাতিকে অগ্নি শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (৫৫ ঃ ১৫) এবং মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে জ্বীনদেরকে সৃষ্টি করার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "ওয়া মা খালাকতোল জ্বেন্না ওয়াল এনছানা ইল্লা লে ইয়াবুদুন"-অর্থাৎ "এবং আমি জ্বীন এবং ইনছানকে তারা আমার এবাদত করবে ব্যতীত সৃষ্টি করিনি" (৫২ ঃ ৫৬)। আর এ কারণেই উভয়ের জন্যেই কেতাব-সহিফা ও নবী-রাসুল তথা শরীয়তও পাঠিয়েছেন এবং তাদের জন্য "সৃষ্টি করেছেন হায়াৎ ও মউত যেন তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে তাদের মধ্যে কে সৎকর্মকারী হয়" (৬৭ ঃ ২)। আর এরই জন্যে তাদের উভয়কেই সৎ-অসৎ এর সংজ্ঞা ও পরিচয়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন কারণ সৎ-অসৎ ও হালাল-হারাম নির্ধারণ করার দায়ীত্ব তাঁরই (তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পৃ.-৯) এবং তা জানার জন্য শরীয়তও প্রেরণ করেছেন ও সে শরীয়ত পালনের জন্য তাদেরকে আদেশও দিয়েছেন, যে আদেশ যথাযথভাবে পালন করলে তারা পাবে বেহেশ্‌ত্ এর পুরস্কার আর না করলে পাবে দোজখের শাস্তি।

দুনিয়ার জীবনে আমরা তো হর হামেশাই দেখছি যে কিছু মানুষ সৎ কর্ম যেমন করে তেমনি আবার কিছু মানুষ এমনও আছে যারা অসৎ কর্মও করে আবার কখনও একজন মানুষই সৎ-অসৎ উভয় প্রকার কর্মই করে, এরূপ হলে তাকে তার অধিকাংশ কর্মের কর্মী বলে ধরা হবে এবং আল্লাহ্ নির্দেশিত সৎ-অসৎ এর নির্দেশ দ্বারা চালিত না হয়ে নিজ প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত ও চালিত হয় যাও আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত নয়–সুতরাং অন্যায় ও পাপ। আর এটাও আমরা দেখি যে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দের চরম ও চিরন্তন রূপ আছে যা ব্যক্তি বা কালভেদে ভিন্ন নয় এবং তাই তার থাকা উচিৎ; অন্যথায় সর্বকালের মানবতার জন্য দাড়াবার মত কোনও সাধারণ ভিত্তিভূমি থাকে না। সুতরাং সৎকর্মশীল মানুষ ও অসৎ কর্মশীল মানুষের মৃত্যুরূপ সমতাসাধক ("Death the leveler")-এর মাধ্যমে অনস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া অভিপ্রেত ও ন্যায়বিচারী হতে পারে না; কর্মভেদে তাদের পরিণতিও ভিন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয় ও ন্যায়বিচারী। সুতরাং

www.pathagar.com

প্রত্যেকেরই মৃত্যু পরবর্তী কোনও এককালে কোনও এক বিচারক কর্তৃক দুনিয়ার জীবনের কর্মসমূহের বিচার হওয়া এবং বিচারের পর শাস্তি-পুরস্কারের ব্যবস্থা হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তাই-ই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ সেই বিচারক এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের হাশরে সকলেরই বিচার হবে-জ্বীন-ইনছান সহ সব জীবেরই এবং শাস্তি-পুরস্কার হবে বর্ণানুসারে সকলেরই। মৃত্যুতেই সব জীবন ও জীবের শেষ নয়। এখন প্রশ্ন হয় মানুষ ও জ্বীন দুইয়ের জন্যই না হয় বেহেশ্ত্-দোজখের পরিণতি নির্ধারিত কিন্তু মানুষ ও জ্বীন বাদে অন্য জীবের শেষ পরিণতি কি?

এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কিছু জানে না; বিজ্ঞানের জ্ঞান মৃত্যু পরবর্তী জীবন পর্যন্ত প্রসারিত নয়। দুনিয়ার জীবনেরই সকলের সব খবরই কি বিজ্ঞান জানে? জানে না। এসব সম্বন্ধে একমাত্র ইসলামই সঠিক তথ্য ও খবর দিতে পারে। ইসলাম বলে যে, যেহেতু জ্বীন ও মানব ছাড়া জীবজগতের আর কেউই আল্লাহ্র তরফ থেকে কোনও শরীয়ত পালনে আদিষ্ট নয়; সুতরাং তাদের জন্য কোনও বেহেশ্ত্-এর পুরস্কার বা দোজখের শাস্তির ব্যবস্থা নেই। তাদের জন্যেও বিচার অবশ্যই হবে তবে তাদের পারস্পরিক প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমেই তাদের শাস্তি -পুরস্কাার হবে পারস্পরিক এবং তা হবে হাশরের বিচারের মাঠেই। এ সম্বন্ধে হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রাসুল (সাঃ) বলেন, "কেয়ামতের দিন সমস্ত ভূপৃষ্ট এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব, জ্বীন, গৃহপালিত ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্রিত করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এমন কি কোনও শিং বিশিষ্ট ছাগল কোনও শিং বিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তারও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবে– মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফেরেরা আকাংখা করবে হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম! এরূপ হলে আমরাও হিসাব-নিকাশ থেকে বেঁচে যেতাম।" (আল কোরআন; ৭৮ ঃ ৩৮-৪০ ও তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পৃ.-১৪৩৩)। এ আয়াত শরীফে আল্লাহ্ বলেন, "... সেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে স্বহস্তে অগ্রে প্রেরণ করেছিল; আর তখন কাফের ব্যক্তি বলবে হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।" (৭৮ ঃ ৩৮)। প্রশ্ন হতে পারে ফেরেশতারা কি? তারা কি জীব নয়? উত্তর এই যে না, তারা জীব নয় (তফসির মা'আরেফুল কোরআন, পৃ.-৮৭৬)। তারা আল্লাহ্র এক বিশেষ ধরণের সৃষ্টি, তারা Robotic, Automata।

www.pathagar.com

জ্বীন ও মানবজাতি সহ সমগ্র জীবজগতের ইহাই শেষ পরিণতি। কারও জীবনই উদ্দেশ্যহীন নয়; কারণ সর্বস্রষ্টা আল্লাহ্ স্বয়ংই উদ্দেশ্যময়।

সমাপ্ত

প্রাপ্তিস্থান

সিটি বুক হাউস
বেড়া কলেজ রোড
বেড়া, পাবনা-৬৬৮০
মোবাইলঃ ০১৭১১ ৪৪৭০০৫
বিশ্কিনি মার্ট
২৯, নিউমার্কেট, পাবনা-৬৬০০
মোবাইলঃ ০১৭১২ ৫৭৮৩১৯
হ্যাপি বুক হাউজ
ইসলামিয়া মার্কেট
(রাফিন প্লাজার নিকটে)
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইলঃ ০১৭১১ ০৩৩০১৭
বই ঘর
কুয়েট রোড, ফুলবাড়ীগেট, খুলনা
মোবাইলঃ ০১৯২৩ ৪০৪৭৪১

www.pathagar.com

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মোঃ আব্দুল ওয়াহাব পাবনা জেলার বেড়া থানার জোড়দহ গ্রামে ৩১ মার্চ ১৯২৯ইং তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম জুড়ান উদ্দীন প্রামাণিক। মাতা মরহুমা রিজিয়া বেগম। তিনি ১৯৪৬ সালে বেড়া বি.বি. ইংলিশ হাই স্কুল বর্তমান বি.বি. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ বর্তমান ঢাকা কলেজ থেকে ২৮তম স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগ পেয়ে আই.এস.সি. পাস করেন। অতঃপর একই সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। দুই বৎসর অধ্যয়ন করার পর M.B.B.S ১ম বর্ষ পরীক্ষার পূর্বে তাঁর পিতা মারা যান। পিতৃবিয়োগজনিত কারণে অর্থনৈতিক অনটনে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে প্রায় দুই বৎসর অর্ডন্যাল-ডিপোতে চাকরি করেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের প্রেরণায় তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বি.এস.এস. পাস করেন এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকায় A.G.E.B (Accountant General of East Bengal)-এ যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে একটানা দশ মাস পক্ষাঘাত রোগে ভোগার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। অতঃপর বিভিন্ন স্কুলে (নাকালিয়া হাই স্কুল, বেড়া জুনিয়র হাই স্কুল, বেড়া বি.বি. হাই স্কুল) শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতাকালীন সময়ে ইংরেজিতে মাস্টার্স পরীক্ষা দেয়ার ইচ্ছায় তিনি ১৯৬৮ সালে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বি.এ (প্রাইভেট) পাস করেন।

পরবর্তীতে মাস্টার্স পরীক্ষা আর দেয়া হয়নি। ১৯৯১ সালে তিনি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে অবসর যাপন ও লেখালেখি করে সময় কাটাচ্ছেন।

ISBN 984 -70336-0007-1